POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই যারা তোমার হাতে বায়‘আত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই হাতে বায়‘আত করে। আল্লাহর হাতই তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব যে কেউ তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে তো নিজেরই ক্ষতির জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। আর যে ব্যক্তি সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করে, যা সে আল্লাহর সঙ্গে করেছে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (আল মায়েদা: ৭৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 11

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 3

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 15 Jan 2026 25 রজব 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আল্লাহর পরিবার তাঁর সৃষ্টিজগত

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, “হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, অথচ তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা (রোগী দর্শন) করনি।” তখন বান্দা বলবে, “হে আমার রব! আমি কীভাবে তোমার সেবা করতাম, যখন তুমি তো সারা জগতের প্রতিপালক?”আল্লাহ বলবেন, “তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল এবং তুমি তাকে দেখতে যাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তবে তুমি আমাকে তার কাছেই পেতে?

“হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি।” তখন আদম সন্তান বলবে, “হে আমার রব! আমি কীভাবে তোমাকে খাদ্য দিতাম, যখন তুমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক?” আল্লাহ বলবেন, “তোমার কি স্মরণ নেই যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, অথচ তুমি তাকে খাদ্য দাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খাদ্য দিতে, তবে তার প্রতিদান তুমি আমার নিকটেই পেতে?

“হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি।” তখন আদম সন্তান বলবে, “হে আমার রব! আমি কীভাবে তোমাকে পানি পান করাতাম, যখন তুমি তো সারা জগতের প্রতিপালক?”আল্লাহ বলবেন, “আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে, তবে তার প্রতিদান তুমি আমার নিকটেই পেতে।”

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির্র ওয়াস্-সিলাহ, রোগী দর্শনের ফযিলত সম্পর্কিত অধ্যায়)

প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন:

“তাকওয়া ও আল্লাহভীতি জ্ঞান থেকেই জন্ম নেয়। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল তারাই আল্লাহকে ভয় করে, যারা জ্ঞানী’ (সূরা ফাতির, ৩৫:২৯)। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহভীতির জন্ম দেয়। আর আল্লাহ তাআলা জ্ঞানকে তাকওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন-এমনভাবে যে, যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে জ্ঞানী হবে, তার মধ্যে অবশ্যই আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে।” তিনি আরও বলেন:

“‘জ্ঞান’ বলতে আমার দৃষ্টিতে কুরআনের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। এখানে দর্শন, বিজ্ঞান বা প্রচলিত অন্যান্য বিদ্যার কথা বোঝানো হয়নি; কারণ সেগুলি অর্জনের জন্য তাকওয়া ও নেককারির কোনো শর্ত নেই। যেমন একজন পাপী ও দুষ্কৃতকারী সেগুলি শিখতে পারে, তেমনি একজন ধার্মিক মানুষও শিখতে পারে। কিন্তু কুরআনের জ্ঞান কেবল তাকওয়াবান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়। সুতরাং এখানে ‘জ্ঞান’ বলতে কেবল কুরআনের জ্ঞানই বোঝানো হয়েছে, যেখান থেকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি জন্ম নেয়।”

(মালফূজাত, খণ্ড ৪, পৃ. ৫৯৯, সংস্করণ ২০০৩, মুদ্রিত)

প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) আরও বলেন:

“‘আলেম’ শব্দটি দ্বারা যেন কেউ বিভ্রান্ত না হয়। প্রকৃত আলেম সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল তারাই আল্লাহকে ভয় করে, যারা জ্ঞানী’ (সূরা ফাতির, ৩৫:২৯)। তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব (বন্দেগি) ও আল্লাহভীতি এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে তারা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে জ্ঞান ও মারিফত অর্জন করে এবং সেখান থেকেই ফয়েজ লাভ করে। এই মর্যাদা ও স্তর অর্জিত হয় হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালোবাসার মাধ্যমে-এমনকি মানুষ সম্পূর্ণভাবে তাঁর রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়।”

(মালফূজাত, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪, সংস্করণ ২০০৩, রাবওয়া থেকে মুদ্রিত)

খোদার প্রতি ভক্তিজনিত ভীতি

হযরত মুসলেহ-এ-মাও‘উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূরা আল-রাদ এর ২২ নম্বর আয়াত- এর ব্যাখ্যায় বলেন:

‘খাশিয়াত’ (ভক্তিজনিত ভয়) শব্দটির মধ্যে ‘মা‘রিফাত’-অর্থাৎ যাঁর প্রতি ভয় অনুভূত হয়, তাঁর প্রকৃত পরিচয় ও গভীর উপলব্ধির অর্থও নিহিত রয়েছে। অন্য কথায়, ‘খাশিয়াত’ শব্দটি তখনই ব্যবহৃত হয়, যখন মানুষ সেই সত্তার সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা অর্জন করে, যাঁর প্রতি সে ভয় পোষণ করে। তদুপরি, এই ভয় কোনো ক্ষতি বা লোকসানের আশঙ্কা থেকে উদ্ভূত নয়; বরং এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় যে, যাঁর প্রতি ভয় করা হচ্ছে, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদা ও মহিমার অধিকারী। এটি এমন এক ভয়, যা এই আশঙ্কা থেকে সৃষ্টি হয় যে নিজের কোনো অবহেলার কারণে মানুষ যেন তাঁর নৈকট্য হারিয়ে না ফেলে।

‘খাশিয়াত’ (ভক্তিভরা ভয়) শব্দটির মধ্যে ‘মা‘রিফাত’-অর্থাৎ যাঁর প্রতি ভয় অনুভূত হয়, তাঁর প্রকৃত পরিচয় ও গভীর উপলব্ধির অর্থও নিহিত রয়েছে। অন্য কথায়, ‘খাশিয়াত’ শব্দটি তখনই ব্যবহৃত হয়, যখন মানুষ সেই সত্তার সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা অর্জন করে, যাঁর প্রতি সে ভয় পোষণ করে। তদুপরি, এই ভয় কোনো ক্ষতি বা লোকসানের আশঙ্কা থেকে উদ্ভূত নয়; বরং এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় যে, যাঁর প্রতি ভয় করা হচ্ছে, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদা ও মহিমার অধিকারী। এটি এমন এক ভয়, যা এই আশঙ্কা থেকে সৃষ্টি হয় যে নিজের কোনো অবহেলার কারণে মানুষ যেন তাঁর নৈকট্য হারিয়ে না ফেলে।

অতএব, আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ‘খাশিয়াত’-এর অর্থ হলো-যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও নৈকট্যের স্তরে উপনীত হয় এবং তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে এই স্তরই তার প্রকৃত প্রশান্তি ও পূর্ণতার স্থান, তখন সে এই নৈকট্য হারানোর চিন্তাও সহ্য করতে পারে না। ফলে সে সর্বদা এর সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকে এবং পূর্ণ যত্ন গ্রহণ করে, যাতে কোনো অবহেলার কারণে তার প্রাপ্ত নৈকট্যের এই মর্যাদা নষ্ট না হয়ে যায়।

এই নিদর্শনের দ্বিতীয় দিকটি এই বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে: “এবং তারা মন্দ হিসাবের ভয় করে”(ওয়া ইয়াখাফূনা সূআল-হিসাব)। অর্থাৎ একদিকে যেমন সে আল্লাহর নৈকট্যের স্তর রক্ষা করার চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, তেমনি অন্যদিকে সে এই আশঙ্কাও পোষণ করে যে সৃষ্টিজগতের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শনের যে দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছে, তাতে কোনো ত্রুটি বা অবহেলার কারণে সে যেন আল্লাহ তা‘আলার অসন্তোষের যোগ্য না হয়ে যায়।

যেহেতু প্রথম দুইটি নিদর্শনে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ককে মূল লক্ষ্য এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতিকে তার ফল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই তৃতীয় প্রমাণে আল্লাহ তা‘আলা সেই অনুযায়ী আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের কোনো ঘাটতির ক্ষেত্রে ‘খাশিয়াত’ শব্দটি এবং সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কের ঘাটতির ক্ষেত্রে ‘খাওফ’ (ভয়) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কারণ প্রথম শব্দটি এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে যে যাঁর প্রতি ভয় করা হচ্ছে, তিনি স্বয়ং লক্ষ্যবস্তু; আর ‘খাওফ’ শব্দটি অপরিহার্যভাবে এমন কিছুর জন্য ব্যবহৃত হয় না যা স্বয়ং লক্ষ্যবস্তু, বরং অনেক সময় এমন কিছুর জন্য ব্যবহৃত হয় যেখান থেকে দূরে সরে যাওয়াই উদ্দেশ্য-যদিও কখনো কখনো লক্ষ্যবস্তু সত্তার অসন্তোষের ক্ষেত্রেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

চলো কাদিয়ান যাই!

বর্তমানে কাদিয়ান দারুল আমানে জলসা সালানার প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। একই সঙ্গে প্রতিটি আহমদীর হৃদয়ও জালসায় অংশগ্রহণের আগ্রহে উদ্দীপ্ত-উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকদের মতোই উচ্ছ্বাসে ধুকপুক করছে। বয়োজ্যেষ্ঠ, শিশু, নারী-এমনকি প্রবীণ সদস্যরাও অধীর আগ্রহে জালসার প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সবার জন্য সহজতা সৃষ্টি করুন এবং সুস্থতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে জলসা সালানা কাদিয়ানে উপস্থিত হওয়ার এবং আল্লাহর পবিত্র নিদর্শনসমূহের বরকত থেকে প্রাচুর্যসহ উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

এ বছর হুযূর-ই-আনওয়ার (আইদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজিজ)-এর অনুমোদনে জলসা সালানা কাদিয়ান ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর-শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার-অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই ইলাহী সমাবেশ সম্পর্কে সাইয়্যিদুনা হযরত মির্জা গুলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন:

"এই সমাবেশকে সাধারণ কোনো সভা মনে করো না। এটি এমন এক বিষয়, যার ভিত্তি খাঁটি ইলাহী সমর্থন এবং ইসলামের কালিমার উচ্চতায়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে স্থাপন করেছেন এবং তিনি এর জন্য এমন জাতিসমূহ প্রস্তুত করেছেন, যারা শিগগিরই এতে অন্তর্ভুক্ত হবে; কারণ এটি সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কাজ, যার কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।" (ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর ১৮৯১)

অনুরূপভাবে তিনি (আলাইহিস সালাম) আরও বলেছেন:

"সাধ্য অনুযায়ী সকল বন্ধুদের উচিত আধ্যাত্মিক বাণী শ্রবণ ও দোয়ায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে এই নির্ধারিত তারিখে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপস্থিত হওয়া। এই সমাবেশে এমন সব সত্য ও মারিফাতপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হবে, যা ঈমান, ইয়াকীন ও মারিফাতের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। তদুপরি, এসব বন্ধুদের জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ মনোযোগ থাকবে এবং সাধ্য অনুযায়ী দয়াবান আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করা হবে, যেন আল্লাহ তাআলা তাদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন, তাদের গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন।"

তিনি আরও বলেন: "এই সমাবেশগুলোর একটি সাময়িক উপকার এটিও হবে যে, প্রতি নতুন বছরে যারা এই জামাতে নবাগত ভাই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে, তারা নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হয়ে পূর্বতন ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, পরিচিত হবে এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও পরিচয়ের বন্ধন ক্রমাগত দৃঢ় হবে। তদ্রুপ, এই সময়ে যদি কোনো ভাই এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তবে এই সমাবেশে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হবে। সকল ভাইকে একত্রিত করার জন্য এবং তাদের মধ্যকার শুষ্কতা, বিচ্ছিন্নতা ও দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত দরবারে প্রচেষ্টা করা হবে। এই আধ্যাত্মিক সমাবেশে আরও বহু আধ্যাত্মিক উপকার ও কল্যাণ থাকবে, যা ইনশাআল্লাহ কাদির সময়ে সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে।" (আসমানি ফয়সালা, পৃ. ৯-১০)

এই বরকতময় জালসার অতিথিদের জন্য সাইয়্যিদুনা হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আলাইহিস সালাম) স্বয়ং অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। প্রারম্ভিক জালসা সালানাগুলোর সময়, যখন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন হযরত মির্জা নাসির নওয়াব সাহেব (রাদিয়াল্লাহু আনহু), একবার অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য অর্থের সংকট দেখা দেয়। তখন তিনি-যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্মানিত শ্বশুর ছিলেন-তাঁর নিকট এসে জানান যে পরদিন অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য কোনো অর্থ অবশিষ্ট নেই। প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) তাঁকে নির্দেশ দেন, তাঁর স্ত্রী (উম্মুল মুমিনীন নুসরাত জাহান বেগম সাহিবা)-এর গয়না নিয়ে তা বিক্রি করে অতিথিদের ব্যবস্থাপনা করতে। অতএব গয়না বিক্রি করা হলো এবং অতিথিদের ব্যবস্থা করা হলো।

পরদিন হযরত মির্জা নাসির নওয়াব সাহেব পুনরায় জানান যে গয়না বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থে কেবল এক দিনের ব্যয়ই মেটানো গেছে, পরবর্তী দিনের জন্য আবার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) বলেন, তাঁদের সাধ্য অনুযায়ী যা ছিল তা ব্যয় করা হয়েছে; এখন যাঁর অতিথি, তিনিই স্বয়ং ব্যবস্থা করবেন।

এই ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কাপুরথালভি বলেন, পরদিন ডাক-পিয়ন এসে কয়েকটি মানি অর্ডার নিয়ে আসে, যেগুলোর সঙ্গে লেখা ছিল: "আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জলসা সালানায় উপস্থিত হতে পারিনি; তাই অতিথিদের সেবার জন্য এই অর্থ প্রেরণ করা হলো।" প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) হযরত মির্জা নাসির নওয়াব সাহেবকে ডেকে মানি অর্ডারগুলো তাঁর হাতে তুলে দেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন-যে পরিমাণে একজন দুনিয়াদার নোটভর্তি সিন্দুকের ওপর নির্ভর করে, তার চেয়েও অধিক তিনি আল্লাহ তাআলার সত্তার ওপর নির্ভর করেন।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কাপুরথালভি আরও বর্ণনা করেন, একবার জালসায় এত অধিক অতিথি এসেছিলেন যে বিছানাপত্রের ঘাটতি দেখা দেয়। স্বেচ্ছাসেবকরা সব ঘর থেকে কাঁথা সংগ্রহ করেন, এমনকি প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর বাড়ি থেকেও-এতটাই যে তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্যও কোনো কাঁথা অবশিষ্ট থাকেনি। বর্ণনাকারী যখন তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন, দেখেন যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে কোনো কাঁথা নেই এবং তাঁর এক পুত্র-সম্ভবত হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ-একটি ওভারকোট গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের তিরস্কার করলে তারা বলেন, যাদের দেওয়া হয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে এখন ফেরত আনা কঠিন। বহু কষ্টে কোথাও থেকে একটি কাঁথা এনে উপস্থিত করা হলে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, তাঁর ঘুম আসছে না-রাত কোনোভাবে কেটে যাবে; বরং এই কাঁথাটি অন্য কোনো অতিথিকে দেওয়া হোক। ফলে সেটিও অন্য এক অতিথিকে দেওয়া হয়।

এই ঘটনাবলি থেকে স্পষ্ট হয়, জালসার অতিথিদের কাছে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর দৃষ্টিতে কতখানি গুরুত্ব ছিল। তিনি জালসার অতিথিদের নিজের অতিথি হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁর জীবনচরিতের এই দিকটি আমাদের শেখায়-জালসা সালানার অতিথিদের সেবাকে আমাদের কতটা গুরুত্ব দিতে হবে; কেননা আল্লাহর মসীহ নিজেকেও তাদের ওপর অগ্রাধিকার দেননি।

এই আলোচনার সমাপ্তি টানি প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর সেই দোয়াগুলোর মাধ্যমে, যা তিনি জালসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য করেছিলেন। তিনি বলেন:

"এই ইলাহী সমাবেশের উদ্দেশ্যে যারা সফর গ্রহণ করে, আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে থাকুন, তাদেরকে মহান প্রতিদান দান করুন, তাদের ওপর রহম করুন, তাদের কষ্ট ও উদ্বেগের অবস্থা সহজ করে দিন, তাদের দুঃখ-ক্লেশ দূর করুন, সব ধরনের কষ্ট থেকে মুক্তি দান করুন, তাদের কামনা পূরণের পথ খুলে দিন এবং কিয়ামতের দিনে তাদেরকে সেই বান্দাদের সঙ্গে উঠান যাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া রয়েছে। আর তাদের সফর সমাপ্তির পরও তিনি তাদের অভিভাবক হয়ে থাকুন। হে আল্লাহ! হে মহিমা ও ক্ষমার অধিকারী! হে পরম দয়ালু ও কষ্টনিবারক! এই সমস্ত দোয়া কবুল করুন এবং সুস্পষ্ট নিদর্শনের মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের বিরোধীদের ওপর বিজয় দান করুন; কেননা সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা কেবল তোমারই।" (ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার ক্ষেত্রে সাইয়্যিদুনা হযরত মির্জা গুলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর এই দোয়াগুলো কবুল করুন এবং জালসার সকল কর্মসূচি-বিশেষ করে হযরত আকদাস আমীরুল মুমিনীন (আইদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজিজ)-এর ভাষণ, যা এমটিএ-তে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে-মনোযোগসহকারে শ্রবণ করার এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

জুমআর খুতবা

তাবুক অভিযানে যারা পিছিয়ে পড়েছিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কঠোর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাদের ফাসিক (অবাধ্য) বলে আখ্যায়িত করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে তাদের জানাযার নামায পড়া এবং তাদের কবরের পাশে দো'আ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদুপরি, এ মর্মে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় যে, ভবিষ্যতে তারা কোনো ধর্মীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে না এবং কোনো সামরিক অভিযানে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

হযরত কা'ব ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলামের হিদায়াত দান করার পর, আমার কাছে এর চেয়ে বড় কোনো নিয়ামত তিনি আর কখনো দান করেননি-যে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে সত্য কথা বলেছিলাম। আল্লাহর শোকর যে আমি তাঁর কাছে মিথ্যা বলিনি; কারণ আমি যদি মিথ্যা বলতাম, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম, যেমন তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যারা মিথ্যা বলেছিল।"

হযরত কা'ব (রা.) আরও বর্ণনা করেন যে, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে সালাম জানালেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনন্দে উজ্জ্বল মুখমণ্ডল নিয়ে উত্তরে বললেন: "তোমাকে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে-আজ তোমার জন্য সেই সর্বোত্তম দিন, যা তোমার মা তোমাকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমার জীবনে অতিবাহিত হয়েছে।" তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! এ সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে?"তিনি উত্তরে বললেন, "না, বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকেই।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আনন্দিত হতেন, তখন তাঁর চেহারা এমনভাবে দীপ্ত হয়ে উঠত যেন তা চাঁদের একটি টুকরো; আর আমরা তাঁর এই দীপ্তি দেখেই তাঁর আনন্দ বুঝে নিতাম।

তাবুক অভিযানে সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবনচরিতের একটি পরিশীলিত বিবরণ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৮ নভেম্বর ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (২৮ নবুয়্যত, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,তাবুক সফরের আরো যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তা আজ বর্ণনা করব; বিগত খুতবাগুলোতে তা বর্ণিত হচ্ছিল।

যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, কতক মুনাফিক যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেছিল এবং বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়েছিল। কিন্তু মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরও মুনাফিকদের (যুদ্ধে) না যাবার ব্যাপারে বিভিন্ন অজুহাত ও বাহানা বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়, বরং পবিত্র কুরআনেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত ছিল, যখনই তিনি সফর থেকে মদীনায় ফেরত আসতেন প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত (নফল) নামায পড়তেন। তিনি (সা.) তাবু ক থেকে ফিরে আসার বেলায় মদীনায় চাশতের সময় প্রবেশ করেন এবং প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়েন। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি (সা.) যখনই সফর থেকে ফেরত আসতেন এমনটিই করতেন।

নফল নামায শেষে তিনি (সা.) মসজিদে বসেন আর লোকেরা তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষা তের জন্য উপস্থিত হতে থাকে। অনুরূপভাবে যারা নিজেদের ঈমানের দুর্বলতা এবং কপটতার কারণে (তাঁর) সঙ্গে যায় নি, তারাও আসতে থাকে। বিশেষভাবে মুনাফিকরা, যাদের আশা ধুলিস্যাৎ হয়েছিল- তারা অধিক লজ্জা ও অনুশোচনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কসম খেতে আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন ধরনের ওজর ও অজুহাত দেখাতে থাকে। জীবনিকাররা লিখেছেন, এরা প্রায় আশিজন ছিল। তবে কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর চেয়েও অধিক লোক ছিল। মহানবী (সা.) তাদের উপস্থাপিত বাহ্যিক অজুহাত মেনে নেন এবং তাদের বয়আত নেন আর তাদের জন্য ক্ষমার দোয়া করেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ্র হাতে সোর্পদ করেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪১৪) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৪১৮)

কিন্তু মুনাফিকদের এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য ছিল, তাই আল্লাহ্তা'লা তাদের সম্পর্কেমহানবী (সা.)-কে ওহীযোগে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এরা এমন অপবিত্র মানুষ যে, খোদা কখনো তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। বস্তুত তাদের সম্পর্কে সূরা তাওবায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۴﴾ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۙ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۹۵﴾ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۹۶﴾

অর্থাৎ, তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে তারা তোমাদের কাছে (নানান) অজুহাত প্রদর্শন করবে। তুমি বলো, 'তোমরা অজুহাত প্রদর্শন কোরো না, আমরা কখনো তোমাদের বিশ্বাস করব না। আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আর অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন। এরপর অদৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ্ র নিকট তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করবেন।' তোমরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তোমাদের সামনে অবশ্যই আল্লাহ্র কসম খাবে যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। কাজেই, তোমরা তাদের উপেক্ষা করো। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলরূপে জাহান্নাম হবে তাদের ঠিকানা। তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, কিন্তু তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ দুষ্কর্মপরায়ণ জাতির প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবেন না।সূরা তওবা: ৯৪-৯৬)

তাবু কের যুদ্ধে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর চরম অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেন, যেমনটি এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। তিনি এই লোকদেরকে ফাসেক (তথা দুষ্কর্মপরায়ণ) আখ্যায়িত করেন। মহানবী (সা.)-কে তাদের জানাযার নামায পড়তে এবং কবরে গিয়ে দোয়া করতে বারণ করেছেন। আর এই নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেছেন যে, ভবিষ্যতে তারা কোনো তাহরীক (বা আহ্বানে) অংশ নেবে না এবং কোনো যুদ্ধেও যোগদান করবে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿۸۱﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۸۲﴾ فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿۸۳﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۸۴﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۸۵﴾ (التوبة:81-85)

অর্থাৎ, পেছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্‌র রসূলের আদেশ লঙ্ঘন করে নিজ জায়গায় বসে থাকায় উল্লসিত। এমনকি তারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ বিসর্জন দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করল এবং বলল, তোমরা প্রচণ্ড গরমে অভিযানকল্পে বের হয়ো না। তুমি বলো, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে বেশি উত্তপ্ত। হায়, তারা যদি বুঝত!অতএব তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ তাদের কম হাসা উচিত আর বেশি কাঁদা উচিত। অতএব আল্লাহ্ তোমাকে তাদের এক দলের কাছে যদি ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তোমার কাছে যুদ্ধে বের হবার অনুমতি চায়, সেক্ষেত্রে তুমি বলো, তোমরা আর কখনো আমার সাথে জিহাদের জন্য বের হবে না এবং কখনো আমার সাথে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। নিশ্চয় তোমরা প্রথমবার বাড়িতে বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে। অতএব এখন পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের সাথেই বসে থাকো। আর তাদের কেউ যখন মারা যায় তুমি কখনো তার জানাযার নামায পড়ো না এবং তার কবরে দোয়ার জন্যও দাঁড়িও না, কেননা তারা আল্লাহ্‌ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায় মারা গেছে। আর তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাকে যেন বিস্ময়াভিভূত না করে। আল্লাহ্ তাদেরকে এসবের মাধ্যমে কেবল এ পৃথিবীতে শাস্তি দিতে চান এবং তিনি চান, কাফির থাকা অবস্থায় যেন তাদের প্রাণ বের হয়ে যায়। (সূরা আত-তাওবা: ৮১-৮৫)এগুলোও সূরা তাওবার আয়াত।

তাবুক যুদ্ধে পেছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিরা ছিল চার ধরনের মানুষ। (প্র থমত) সৌভাগ্যশালী সেসব সদস্য, যারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে কোনো আবশ্যিক দায়িত্ব পালনের জন্য পেছনে থেকে যান। যেমন, হযরত আলী (রা.), ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) প্রমুখ; তারা প্রথম শ্রেণিভুক্ত মানুষ। দ্বিতীয় শ্রেণির লোকেরা তারা, যারা অক্ষম, অসুস্থ ও দুর্বল ছিলেন। তারা চরম অসহায় ও দরিদ্র ছিলেন এবং বাহন ইত্যাদি যোগাড় করার সামর্থ্য রাখতেন না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন, সত্যিকার অর্থে ই তারা নিরুপায় ছিল; এজন্য আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বরং যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.) তাদের সম্পর্কে বলেছেন, তারা সর্বত্র আমাদের সাথেই ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পুরস্কার ও পুণ্যের মাঝে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৪২৩)

তৃতীয় (দলটি ছিল) মুনাফিকদের, যাদের কর্মকাণ্ডের কঠোর নিন্দা করা হয়েছে এবং পবিত্র কুরআনে চিরকালের জন্য তাদের প্র তি অসন্তুষ্টি, কঠিন শাস্তি এবং সাবধানবাণী অবতীর্ণ হয়েছে। চতুর্থত ছিল তারা, যারা কেবল অলসতার কারণে অংশগ্রহণ করে নি এবং পেছনে থেকে যায়। তাদের মধ্যে তিনজন সাহাবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আর তারা হলেন- হযরত কা'ব বিন মালিক, হযরত মুরারা বিন রবী এবং হযরত হিলাল বিন উমাইয়া। এই তিন সাহাবী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে:

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۱۹﴾

অর্থাৎ, আর পেছনে রেখে দেওয়া সেই তিনজনের প্রতিও (আল্লাহ্ তা'লা তওবা গ্রহণ করে অনুগ্রহ করেছেন)। এমনকি পৃথিবী যখন এর (সমস্ত) বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল আর তাদের কাছে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ল আর তারা উপলব্ধি করল, আল্লাহ্‌র (অসন্তুষ্টি) থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁরই আশ্রয় ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নাই। তখন তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন যেন তারা তওবা করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লাই বারবার তওবা গ্রহণকারী, বার বার কৃপাকারী। (সূরা আত-তাওবা:১১৮)

اَلثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا অর্থাৎ সেই তিনজন যাদের পেছনে রাখা হয়েছিল- তাদের ঘটনার বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে: বুখারীর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.) নিজেই এই পুরো ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহ্‌ররসূল (সা.)-এর সাথে কোনো অভিযানেই যাওয়া বাদ রাখি নি যা তিনি করেছেন, কেবল তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া। হ্যাঁ, বদরের যুদ্ধেও আমি পেছনে রয়ে গিয়েছিলাম, তবে তিনি (সা.) এই যুদ্ধ থেকে পেছনে রয়ে যাওয়া কারো প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.)কেবল কুরাইশের কাফেলাকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন; কিন্তু ফলাফল এটা দাঁড়ায় যে, যুদ্ধের পূর্ব পরিকল্পনা না থাকার পরও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শত্রুর মুখোমুখি করে দেন। আর আমি আকাবার রাতেও মহানবী (সা.)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের ওপর অটল থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ও চুক্তি করেছিলাম। আর আমি সেই রাতের বিনিময়ে আমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে চাই না। [তিনি মনে করতেন, আকাবায় করা বয়আতের অঙ্গীকার বদরের চেয়ে বড়ো বিষয়।] যদিও বদর মানুষের মাঝে বেশি প্রসিদ্ধ। আর আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি কখনোই এতটা শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম না, যতটা না আমি তাঁর (সা.) সাথে এই যু দ্ধে যাওয়া থেকে পেছনে রয়ে যাবার সময় ছিলাম। [এখন তিনি তাবুকের ঘটনার কথা বলছেন যে, সেই সময় আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি বেশ সচ্ছল ও শক্তিশালী ছিলাম।] আল্লাহ্‌র কসম! এর আগে আমার কাছে কখনোই উট জোগাড় হয় নি, আর এই যুদ্ধের সময় আমি দুটি উট যোগাড় করে নিয়েছিলাম।[এরপর তিনি বিস্তারিত বলছেন যে,] মহানবী (সা.) যখনই কোনো যুদ্ধের সংকল্প করতেন, তখন তিনি তা গোপন রাখতেন এবং অন্য কোনো দিকে যাবার ভাব দেখাতেন। [মহানবী (সা.)-এর যুগে এটিই তাঁর যুদ্ধের সাধারণ নীতি ছিল।] কিন্তু যখন এই যুদ্ধ হয়, তখন মহানবী (সা.) প্রচণ্ড গরমের সময় এই যুদ্ধের জন্য বের হন এবং সামনে ছিল দীর্ঘ সফর, জনমানবহীন মরুভূমি এবং বিশাল সংখ্যক শত্রু। তিনি মুসলমানদের কাছে তাদের পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে অবহিত করে দেন; [এক্ষেত্রে তিনি গোপন করেন নি, বরং বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা এই যুদ্ধে যাচ্ছি;] যেন তারা যুদ্ধের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে। তিনি (সা.) তাদেরকে সেই দিকটির কথাও জানিয়ে দেন যেদিকে তিনি যেতে চান। আর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে প্রচুর মুসলমান ছিলেন এবং তাদের সংখ্যা লিখে রাখার মতো কোনো খাতা ছিল না। [হযরত কা'বের এ কথার অর্থ হলো, কোনো রেজিস্টার ছিল না এবং কারা কারা সাথে যাচ্ছে না যাচ্ছে তাদের নামধাম লেখা ছিল না।]

হযরত কা'ব বলতেন, যারা অনুপস্থিত থাকতে চাইছিল তাদের মাঝে কেউই এমন ছিল না যে ধারণা করবে যে, তার অনুপস্থিতি মহানবী (সা.)-এর অজানা থাকবে; [অর্থাৎ যদিও (যাত্রাকারীদের নামধাম) কিছু লেখা হয় নি, তবুও এই ধারণা কারো মনে আসত না যে, অনুপস্থিত থাকলে তা তাঁর (সা.) অজানা থাকবে;] যতক্ষণ না তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার ওহী নাযিল হয়। আর মহানবী (সা.) এই যুদ্ধটি এমন সময় করেছিলেন যখন ফল পেকে গিয়েছিল এবং ছায়া ছিল মনোরম। মহানবী (সা.) সফরের প্রস্তুতি নেওয়া আরম্ভ করেন এবং তাঁর সাথে মুসলমানরাও। [এবার তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলছেন,] আমি সকালে যেতাম যেন আমিও তাদের সাথে সফরের প্রস্তুতি নিতে পারি; [অর্থাৎ যাবার জন্য তিনি দৃঢ়প্র তিজ্ঞ ছিলেন;] কিন্তু আমি ফিরে আসতাম এবং কিছুই করা হতো না। অর্থাৎ অলসতা ছিল, প্রস্তুতি নেওয়া হতো না। আমি মনে মনে বলতাম, আমি তো প্রস্তুতি নিতে পারবই; কাল নিয়ে নেব। এই চিন্তাই আমাকে গড়িমসির মাঝে আটকে রাখে। এমনকি সেই সময় চলে আসে যখন মানুষের সফরের তাড়া পড়ে যায় এবং মহানবী (সা.) এক সকালে রওয়ানা হয়ে যান, আর মুসলমানরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হয়। অথচ আমি আমার সফরের প্রস্তু তির কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারি নি। আমি ভাবলাম, মহানবী (সা.)-এর যাওয়ার এক বা দুই দিন পর প্রস্তুতি নিয়ে নেব এবং এরপর গিয়ে তঁ াদের সাথে মিলিত হব। তাদের চলে যাবার পরের দিন সকালে আমি বাহিরে গেলাম জিনিসপত্রগোছাতে, কিন্তু আবার ফিরে এলাম এবং কিছুই করলাম না। পরের দিন আবার যাই এবং ফিরে আসি, কিছুই গোছানো হয় নি। এভাবেই চলতে থাকে। এদিকে সেনাবাহিনী দ্রুত সফর করে অনেক দূর এগিয়ে যায়। আমিও সংকল্প করি যে, রওয়ানা হব এবং তাদের ধরে ফেলব। হায়, যদি আমি এমনটা করতাম! কিন্তু আমার ভাগ্যে তা-ও জোটে নি।রসূলুল্লাহ্ (সা.) চলে যাবার পর যখনই আমি মানুষের মাঝে বের হতাম এবং তাদের মাঝে ঘোরাঘুরি করতাম, তখন এই বিষয়টি আমাকে খুব ব্যথিত করত যে, আমি কেবল এমন লোকদেরই দেখতাম যাদের মাঝে কপটতা রয়েছে বলে সবাই জানত, নতুবা দুর্বলদের মধ্য থেকে এমন কাউকে দেখতাম যাকে আল্লাহ্ নিরুপায় আখ্যা দিয়েছেন। আর মহানবী (সা.)-ও যখন তাবুকে পৌঁছেন তখন আমাকে স্মরণ করেন। তিনি তাবুকে লোকদের সাথে বসা অবস্থায় জিজ্ঞেস করেন, কা'ব কোথায়? বনু সালামার এক ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্‌ররসূল (সা.)! তাকে তার দুটি চাদর এবং নিজের ডানে-বামে ফিরে তাকানো আটকে রেখেছে। [অর্থাৎ হয়ত অহংকার বা গর্বের কারণে আসে নি।] হযরত মুআয বিন জাবাল একথা শুনে, অর্থাৎ সেই সাহাবীর এই কথা শুনে বলেন, তুমি কা'ব সম্পর্কে কত-না মন্দ কথা বললে! আল্লাহ্‌র কসম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা তাকে ভালো ব্যক্তি বলেই জানি। এটা শুনে মহানবী (সা.) নীরব থাকেন।হযরত কা'ব বিন মালিক বলতেন, যখন আমার কাছে এই খবর পৌঁছে যে, তিনি (সা.) ফিরে আসছেন, তখন আমার দুশ্চিন্তা হয় আর আমি মিথ্যা কথা ভাবতে থাকি যে,আগামীকাল কী বলে বা কোন অজু হাত দেখিয়ে আমি তাঁর (সা.) অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচব? আমার পরিবারের প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ নিই। যখন বলা হলো, মহানবী (সা.) এসে পৌঁছেছেন- তখন আমার মন থেকে সমস্ত মিথ্যা চিন্তা উবে যায় এবং আমি বুঝতে পারি, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমি কখনোই তাঁর (সা.) অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পারব না। তাই আমি তাঁর (সা.) কাছে সত্য কথা বলার সিদ্ধান্ত নিই। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আগমন করেন। যখন তিনি কোনো সফর থেকে আসতেন, তখন প্রথমে মসজিদে যেতেন, সেখানে দুই রাকআত নামায পড়তেন এবং এরপর লোকদের সাথে সাক্ষাতের জন্য বসতেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

এবং ওজর–আপত্তি উপস্থাপন করতে ও কসম খেতে থাকে। এমন লোকের সংখ্যা ছিল আশির কিছু বেশি। মহানবী (সা.) তাদের বাহ্যিক অজুহাত মেনে নেন, তাদের কাছ থেকে বয়আত নেন এবং তাদের ক্ষমা লাভের জন্য দোয়া করেন আর তাদের গোপন বিষয় আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দেন। এরপর আমি তাঁর কাছে আসি। আমি যখন তাঁকে (সা.) সালাম দিই তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির মতো মুচকি হাসেন। [অর্থাৎ হাসলেন, তবে তা অসন্তুষ্টির হাসি।]এরপর তিনি (সা.) বলেন, সামনে আসো। আমি অগ্রসর হই এবং তাঁর সম্মুখে বসে পড়ি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কোন বিষয়টি তোমাকে পেছনে আটকে রেখেছে? তুমি কি কোনো বাহন ক্রয় করো নি?

তখন আমি বলি, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি মনে করি,আমি যদি আপনি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে অবশ্যই (মিথ্যা)ওজর–আপত্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে তার অসন্তুষ্টির হাত থেকে বেঁচে যেতাম, কেননা আমি বাক্‌পটু । কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, আমি ভালো করে জানি, আজ যদি আমি আপনার কাছে এমন কোনো মিথ্যা কথা বলি যার ফলে আপনি হয়ত আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু অচিরেই আল্লাহ্ আমার প্রতি আপনাকে অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর আপনার কাছে যদি সত্য কথা বলি যার ফলে আপনি হয়ত আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু এর ফলে আমি আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমা লাভের আশা রাখি।

তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার কোনো অজুহাত নেই। আল্লাহ্‌র কসম! এই অভিযানের পূর্বে কখনো এত শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম না যতটুকু আপনার (সা.) সাথে এই অভিযানে না গিয়ে পেছনে থাকার সময় ছিলাম। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সে তো সত্য কথা বলে দিয়েছে! তুমি এখন চলে যাও, যতদিন না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। [তিনি (সা.) বলেন, তুমি তো সত্য বলেছ; এখন এখান থেকে চলে যাও। আল্লাহ্ তোমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন যে, তোমার সাথে কী আচরণ করা হবে।]অতএব আমি উঠে চলে গেলাম। তখন বনু সালামার কতিপয় লোক আমাকে অনুসরণ করে। তারা আমাকে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি ইতিপূর্বে কোনো অপরাধ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সামনে কোনো অজুহাতও উপস্থাপন করতে পারলে না, যেমনটি পেছনে রয়ে যাওয়া অন্য ব্যক্তিরা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে? আর তোমার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর ক্ষমাপ্রার্থনাই তো তোমার এই পাপ ক্ষমা করানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।আল্লাহ্‌র কসম! তারা আমাকে অনবরত ভর্ৎসনা করতে থাকে। এমনকি আমিও (মনে মনে) ভাবলাম; [তিনি বলেন, তখন আমার সংকল্প বদলে গেল; অর্থাৎ ভাবলাম,] ফিরে গিয়ে আগের কথা প্রত্যাখ্যান করব যে, পূর্বে আমি যে কথা বলেছিলাম–তা ভুল ছিল। [অর্থাৎ মহানবী (সা.)–এর সম্মুখে কোনো অজুহাত দাঁড় করাবো।] তখন আমি আমার সাথিদেরকে জিজ্ঞেস করি, [অর্থাৎ যারা বলছিল– যাও, গিয়ে ক্ষমা চাও, অন্য কোনো অজু হাত দেখাও;]আমি তখন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আমার সাথে আর কেউ কি আছে যে তাঁর (সা.) সামনে আমার ন্যায় এমন সত্য কথা বলেছে? তারা বলে, হ্যাঁ, আরো দু ইজন ব্যক্তি আছে;তারাও তা–ই বলেছে যা তুমি বলেছ। আর তাদেরকেও ঐ একই উত্তর দেওয়া হয়েছে যা তোমাকে দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করি, তারা কারা? তারা বলে, একজন মুরারা বিন রবী আমরী এবং অপরজন হলেন হিলাল বিন উমাইয়া ওয়াকফী। তারা আমাকে এমন দু ইজন পুণ্যবান ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরা দু ইজনই আমার জন্য আদর্শ ছিল। যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করে, তখন আমি চলে গেলাম।মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দেন। [অর্থাৎ আমি নতুন কোনো অজুহাত উপস্থাপন করার জন্য ফেরত যাই নি, বরং আমি বাড়িতে চলে গেলাম।

মহানবী (সা.) লোকদের সাথে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন ; অর্থাৎ যারা সেই অভিযানে তাঁর (সা.) পেছনে রয়ে গিয়েছিল– তাদের সাথে।] লোকজন এমন আচরণ করতে লাগল যেন তারা আমাদেরকে চেনেই না। এমনকি এই (চেনা) পৃথিবীও আমার কাছে অচেনা মনে হতে লাগল; আমার সেই চিরপরিচিত পরিবেশ আর থাকল না। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করি। আমার অপর দুই সাথি দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় নিজেদের ঘরেই রয়ে যান এবং ঘরে বসে কাঁদতে থাকেন। আমি যেহেতু তাদের তুলনায় যুবক ছিলাম আর তাদের চেয়ে বিপদাপদ সহ্য করার শক্তিও বেশি রাখতাম, তাই আমি বাইরে বের হতাম ও মুসলমানদের সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করতাম এবং বাজারে চলাফেরা করতাম, কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আর আমি মহানবী (সা.)–এর সমীপেও উপস্থিত হতাম এবং তিনি যখন নামাযের পর নিজ স্থানে বসে থাকতেন তখন তাঁকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলতাম। আমি মনে মনে ভাবতাম, তিনি (সা.) কি আমার সালামের জবাবে ঠোঁট নেড়েছেন, নাকি নাড়েন নি? আমি চোখের কোণ দিয়ে তাকাতাম। আমি তাঁর (সা.) কাছে গিয়ে নামায পড়তাম আর আড়চোখে তাঁকে দেখতাম। যখন আমি নামায পড়তে আরম্ভ করতাম তিনি (সা.) আমার দিকে তাকাতেন, আর যখন আমি তাঁর (সা.) দিকে তাকাতাম তখন তিনি (সা.) আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে লোকজনের এই কঠোর আচরণ অনেকদিন ধরে চলতে থাকায় সেটি আমার জন্য খুব অসহনীয় হয়ে গেল। অগত্যা আমি সেখান থেকে চলে গেলাম এবং আবু কাতাদার বাগানের দেওয়ালে উঠে পড়লাম। তিনি আমার চাচাতো ভাই ছিলেন। [অর্থাৎ তার বাগানে আমি ঢুকে পড়লাম।] আরতিনি আমার কাছে সব মানুষের মধ্যে বেশি প্রিয় ছিলেন। [সদর দরজা দিয়ে না গিয়ে আমি সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে গেলাম।] তিনি বলেন, আমি তাকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলি। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি সালামের জবাবও দিলেন না। আমি বলি, আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তু মি কি জানো না যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি? তিনি নীরব রইলেন। আবার তাকে জিজ্ঞেস করি এবং কসম দিয়ে বলি, কিন্তু তিনি আবারও নীরব থাকেন। আমি তৃতীয়বার তাকে জিজ্ঞেস করি এবং কসম দিই; তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। একথা শুনে আমার চোখ দিয়ে অশ্রুপ্রবাহিত হতে থাকে। আমি পেছন ফিরে দেওয়াল টপকে সেখান থেকে চলে আসি। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আমি যখন মদীনার বাজারের মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম,ঠিক তখন দেখি সিরিয়াবাসী 'নাবাতী' কিছু লোক যারা খাদ্যশস্য বিক্রি করতে মদীনায় এসেছিল তাদের একজন জিজ্ঞেস করছে, কা'ব বিন মালিককে কেউ দেখিয়ে দেবে? একথাশুনে লোকেরা তাকে ইশারায় আমার দিকে নির্দেশ করে। সে আমার কাছে এসে আমাকে একটি চিঠি দেয় যা ছিল গাস্‌সানের বাদশার পক্ষ থেকে। তাতে লেখা ছিল: পরসমাচার এই যে, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, তোমার সাথিরা তোমার সঙ্গে কঠোর আচরণ করেছে এবং তোমাকে একঘরে করে রেখেছে। অথচ আল্লাহ্ তোমাকে এমন ঘরে জন্ম দেন নি যে,তুমি অপমানিত হবে বা তোমাকে বিনষ্ট করা হবে। তুমি আমাদের কাছে এসে সাক্ষাৎ করো, আমরা তোমাকে যথাযথ সম্মান দেবো।

আমি যখন চিঠিটি পড়ি তখন (মনে মনে) বলি, এই চিঠি আরেকটি পরীক্ষা! এমনিতেই আমি একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আর এখন বাদশার পক্ষ থেকে এই লোভ দেখানো চিঠিরূপে আরেক পরীক্ষা এসে গেল। তিনি বলেন, আমি সেই চিঠি নিয়ে একটি চুল্লির কাছে যাই; সেখানে আগুন জ্বলছিল, আমি চিঠিটি তাতেফেলে দিই।

যখন পঞ্চাশ রাতের মধ্যে চল্লি শ রাত পার হলে পরে দেখি, রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বার্তাবাহক আমার কাছে আসছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করি, আমি কি তাকে তালাক দেবো, নাহলে কী করব? তিনি বলেন, (তালাক দেবে না,) শুধু তার কাছ থেকে পৃথক থাকো এবং তার কাছে যেয়ো না। তিনি (সা.) আমার দুই সাথিকেও একই কথা বলে পাঠান। আমি আমার স্ত্রীকে বলি, তু মি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও এবং সেখানেই থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ্ এই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীর ব্যাপারেও একই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল । তার স্ত্রী রসূলু ল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, হিলাল বিন উমাইয়া খুব বৃদ্ধ, তার কোনো চাকরবাকরও নেই। আপনি কি এটি অপছন্দ করবেন যদি আমি তার সেবাযত্ন করি, তার জন্য রান্নবান্না করে দিই, কাপড়চোপড় ধুয়ে দিই? তিনি (সা.) বলেন, না; কিন্তু সে যেনতোমার কাছে না আসে। তু মি শুধু এই সীমার মধ্যেই তার সেবা করতে পারো।

তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তার তো এখন এমন কোনো অনুভূতিই নেই। আল্লাহ্‌র কসম! যেদিন থেকে এই ঘটনা তার সঙ্গে ঘটেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে শুধু কেঁদেই যাচ্ছে। কা'ব বর্ণনা করেন, আমার কিছু আত্মীয় আমাকে বলে, তু মিও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে রসূলুল্ল াহ্ (সা.)–এর কাছ থেকে একই রকম অনুমতি চেয়ে নাও যেন সে তোমার সেবাযত্ন করতে পারে, যেমনটি তিনি হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তার সেবাযত্ন করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বলি, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো কখনোই এ ব্যাপারে রসূলু ল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে অনুমতি চাইবনা। আর কে জানে, এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে কী জবাব দেবেন? আমি তো একজন যুবক। [তিনি তো বৃদ্ধ মানুষ, কিন্তু আমি তো যুবক।]

তারপর আমি আরো দশ রাত অতিবাহিত করি, এমনকি রসূলু ল্লাহ্ (সা.) আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করার পর পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়ে যায়। [অর্থাৎ একঘরে করে রাখার পুরো পঞ্চাশ দিন অতিক্রান্ত হলো।] পঞ্চাশতম রাতের সকালবেলা ফজরের নামায পড়ে আমি আমার ঘরগুলোর একটির ছাদে বসে ছিলাম। তখন আমার অবস্থা ঠিক তেমনটিইছিল যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল আর পৃথিবী এর বিশালতা সত্ত্বে ও আমার কাছে সংকুচিত মনে হচ্ছিল। এমন সময় আমি একজন ঘোষণাকারীর আওয়াজ শুনতে

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

পাই যে সালা' পাহাড়ে উঠে উচ্চৈঃস্বরে বলছিল, হে কা'ব বিন মালিক! তোমার জন্য সুসংবাদ! আমি তা শুনেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ি এবং বুঝে যাই,বিপদ দূর হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরের নামায পড়ে ঘোষণা করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা দয়াপরবশ হয়ে আমাদের ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ সংবাদ পেয়ে লোকেরা আমাদের কাছে সুসংবাদ জানাতে ছুটে আসে এবং আমার অন্য দুই সাথির কাছেও সুসংবাদাতারা যান। এক ব্যক্তি ঘোড়া ছুটিয়ে আমার কাছে আসে, আর আসলাম গোত্রের আরেক ব্যক্তি দৌড়ে সালা' পাহাড়ে উঠে গিয়েছিল এবং তার কণ্ঠস্বর ঘোড়ার আগমনের চেয়ে দ্রুত পৌঁছেছিল। [অর্থাৎ একজন ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল আর অন্যজন পাহাড়ে উঠে জোরে ঘোষণা করে দিয়েছিল।] যখন সেই ব্যক্তি– যার কণ্ঠ আমি প্রথম শুনেছিলাম– আমার কাছে সুসংবাদ দিতে এলো, আমি আমার দুইটি কাপড় খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম, কারণ সে–ই আমাকে (প্র থমে) সু সংবাদ দিয়েছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তখন সেগুলো ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। এরপর আমি আরেকজনের কাছ থেকে ধার করে দুইটি কাপড় নিই, সেগুলো পরে রসূলু ল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে যাই। লোকেরা দলে দলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করছিল এবং তওবা কবুল হওয়ার কারণে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। এটি বলছিল যে, তোমাকে অভিনন্দন! কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তওবা কবুল করেছেন।

হযরত কা'ব (রা.) বলেন, অবশেষে আমি মসজিদে পৌঁছাই। গিয়ে দেখি, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বসে আছেন এবং লোকেরা তাঁকে পরিবেষ্টন করে আছে। আমাকে দেখে হযরত তালহা বিন উবায়দু ল্লাহ্ (রা.) ছুটে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানান। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউই উঠে আমার কাছে আসেন নি আর তালহার এই অনুগ্রহের কথা আমি কখনো ভুলব না। আমি রসূলু ল্লাহ্ (সা.)–কে 'আসসালামু আলাইকুম' বললে তিনি জবাব দেন আর তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দে ঝলমল করছিল। তিনি (সা.) বলেন, তোমার জন্য পরম আনন্দময় ও কল্যাণময় দিনের সু সংবাদ, যে দিনটি তোমার মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেবার পর আজ পর্যন্ত তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন। তিনি বলতেন, আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে? তিনি (সা.) বলেন, না, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

রসূলু ল্লাহ্ (সা.) যখন আনন্দিত হতেন তখন তাঁর চেহারা এতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠত যেন তা এক টুকরো চাঁদ, আর আমরা তা দেখেই বুঝতে পারতাম, তিনি (সা.) খুশি হয়েছেন।

আমি তাঁর সামনে বসে পড়ে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আমার এই তওবা কবুল হওয়ার বিনিময়ে আমার যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে দিচ্ছি যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের খাতিরে কৃত সদকা বলে গণ্য হবে। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমার সম্পত্তির কিছু অংশ নিজের জন্যও রাখো, কেননা এটাই তোমার জন্য শ্রেয় হবে। আমি বলি, তাহলে আমি আমার সেই অংশ রেখে দিচ্ছি যা খায়বারে রয়েছে। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সত্য বলার কারণেই মুক্তি দান করেছেন। তাই আমার তওবার আবশ্যক অংশ হলো– যতদিন আমি বেঁচে থাকব সর্বদা সত্য কথাই বলব। কেননা আল্লাহ্‌র কসম!আমার জানামতে এমন আর কোনো মুসলমান নেই যাকে আল্লাহ্ তা'লা সত্য বলার প্রেক্ষিতে সেভাবে তার পরীক্ষা নিয়েছেন যেভাবে তিনি আমার পরীক্ষা নিয়েছেন– সেই সময় থেকে– যখন থেকে আমি মহানবী (সা.)–এর নিকট প্র কৃত ঘটনা বর্ণনা করেছি। যেদিন আমি মহানবী (সা.)–এর নিকট একথা বর্ণনা করি– সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি জ্ঞানত কোনো মিথ্যা কথা বলি নি। আর আমি আশা পোষণ করি, ভবিষ্যতে যতদিন জীবিত থাকব আল্লাহ্ তা'লা আমাকে (মিথ্যা বলা থেকে) সুরক্ষিত রাখবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূল (সা.)–এর প্রতি এ ওহী অবতীর্ণ করেন: নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুল করে নবী এবং সেসব মুহাজির ও আনসারের প্রতি সদয় হয়েছেন যারা কঠিন সময়ে তার (অর্থাৎ এ নবীর) অনুসরণ করেছে; যদিও তাদের মাঝে এক দলের হৃদয় বক্র হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তিনি তাদের তওবা গ্রহণ করে তাদের প্রতি সদয় হয়েছেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি পরম স্নেহশীল ও বার বার কৃপাকারী।

(সূরা আত–তাওবা:১১৭)

তিনি বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করার পর থেকে কখনোই এর চেয়ে বড়ো কোনো পুরস্কারে আমাকে ভূষিত করেন নি। আমি মহানবী (সা.)–কে সত্য কথা বলে দিয়েছিলাম। আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, মহানবী (সা.)–কে মিথ্যা কথা বলি নি; নতুবা যারা মিথ্যা কথা বলেছিল তাদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম।

আর হযরত কা'ব বর্ণনা করতেন, আর যাদের অজুহাত মহানবী (সা.) মেনে নিয়েছিলেন– তাদের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা আমাদের তিনজন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করা হয়; যখন তারা মহানবী (সা.)–এর সকাশে শপথ করে তখন তিনি (সা.) তাদের (নতুন করে)বয়আত নেন এবং তাদের ক্ষমা লাভের জন্য দোয়া করেন। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখেন যতক্ষণ না আল্লাহ্ ত'লা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।আর সেই সিদ্ধান্ত এটিই ছিল যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

অনুরূপভাবে সেই তিনজনের প্রতিও তিনি অনুগ্রহ করেছেন যাদেরকে পেছনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। আর এখানে আল্লাহ্ তা'লা পেছনে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে যা বলেছেন তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের পেছনে রয়ে যাওয়া নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সেসব ব্যক্তির পেছনে রাখা যারা মহানবী (সা.)–এর সকাশে শপথ করেছিল ওতাঁর (সা.) নিকট (মিথ্যা) অজুহাত উপস্থাপন করেছিলেন, আর তিনি (সা.) তাদের অজুহাত মেনেও নিয়েছিলেন; কিন্তু আমরা সত্য কথা বলেছিলাম।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস–৪৪১৮)

এখন যেহেতু আমি তিনজন প্রয়াত ব্যক্তিরও স্মৃতিচারণ করব, তাদের জানাযা পড়ানো হবে, তাই এর অবশিষ্ট অংশ যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের মতো করে বর্ণনা করেছেন– তা পরবর্তীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্। প্রয়াতদের স্মৃতিচারণের মাঝে প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে হাফেয মুহাম্মদ ইবরাহীম আবেদ সাহেবের, যিনি মুরব্বী সিলসিলা ছিলেন; সম্প্রতি ৭২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***।

তিনি চকওয়ালের একটি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)–র নিকট বয়আত গ্রহণ করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন। মরহুম জন্মগত অন্ধ ছিলেন। গ্রামেই কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। ১৯৬৭ সালে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন ও ১৯৭৭ সালে জামেয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি আরবী ফাযেল পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে কেন্দ্রীয় ইসলাহ ও ইরশাদ বিভাগে, এরপর মাদ্রাসাতুল হিফযের শিক্ষক হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর ফয়সালাবাদের একটি গ্রামেও সেবা প্রদান করেন। এরপর ইন্দোনেশিয়ায় দুই বছরের জন্য মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। কেন্দ্রীয় ইসলাহ ও ইরশাদ বিভাগেও কাজ করেন। পরবর্তীতে দারুয যিয়াফত বিভাগে তাকে মুরব্বী হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। আর দৃষ্টিহীনদের যে কমিটি বানানো হয়েছিল তিনি ২০০০ সালে সে কমিটির সেক্রেটারিও হন। তিনি খিলাফত লাইব্রেরিতেও সেবা প্রদান করার সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি ব্রেইল ভাষাও শিখেছিলেন। তার একজন সহপাঠী বাংলাদেশের মুরব্বী সিলসিলা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব। তিনি বলেন, আমরা জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় একত্রে পড়াশোনা করেছি। হাফেয সাহেব অত্যন্ত মেধাবী ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। কোনো আয়াতের অংশবিশেষ পাঠ করে হাফেয সাহেবকে জিজ্ঞেস করতাম যে, এই আয়াতটি পবিত্র কুরআনের কোন স্থানে রয়েছে? হাফেয সাহেব এক মিনিট চিন্তা করে বলে দিতেন, এই আয়াতটি অমুক সূরার শুরুতে অথবা মধ্যভাগে এসেছে। জামেয়াতে শিক্ষকরা যা পড়াতেন হাফেয সাহেব খুব ভালো স্মরণ রাখতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)–র বিশেষ স্নেহ ছিল তার প্রতি। সে কারণেই তিনি জামেয়াতে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষা অর্জন করেন নি। কিন্তু তবুও জামেয়াতে ভালো শিক্ষা অর্জ ন করেছিলেন। যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)–র কাছে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যেতেন এবং তাঁর কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)–রওহাফেয সাহেবের প্র তি অনেক স্নেহ ছিল।

একইভাবে হানিফ মাহমুদ সাহেবও তার ব্যাপারে অনেক কিছু লিখেছেন, কিছু বর্ণনা করছি। তিনি বলেন, একবার আমি সাড়ে সাত বছর পর আফ্রিকা থেকে ফেরত আসি। আমি তার হাত ধরে জোরে চাপ দিলাম, কিন্তু কোনো কথা বলি নি। হাফেয সাহেব তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলেন এবং আমার নাম ধরে বললেন, কখন এসেছ? অর্থাৎ সাড়ে সাত বছর পরেও শুধু আমার হাতের স্পর্শ দ্বারা আমাকে চিনতে পেরেছেন। হাফেয সাহেব এ কথাও গর্বের সাথে বলতেন যে, পবিত্র কুরআন শোনাতে কোনো ভুল করব না। আর বাস্তবেই এটি সঠিক ছিল। অতঃপর হানিফ সাহেব এই ঘটনা লেখেন, এখানে তিনি জলসায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি আমাকে বলেন, আমি আপনাকে দেখে ফেলেছি। সে সময় আমি বললাম, আপনার তো দৃষ্টিশক্তি নেই, কীভাবে দেখলেন? তিনি বললেন, হৃদয়ের

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

চোখ দিয়ে যা দেখেছি তা বাহ্যিক চোখ দেখতে পারে না। তার মাঝে অনেক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ছিল।

একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্ত কাদির অনেক উর্দ্ধৃতিও তার মুখস্ত ছিল। এই ব্যাপারেও কয়েকজন লিখেছেন। প্রায় সাতচল্লিশ বছর যাবৎ জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্‌র কৃপায় মূসী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র ও চার কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন, তার সন্তানদেরকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ লাইবেরিয়ার মোয়াল্লেম সিলসিলা শেখ আবু বকর জর্জ সাহেবের। সম্প্রতি তিনি ৭০ বছর বয়সে কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***।

কিছুদিন যাবৎ ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ১৯৮০ সালে সিয়েরালিওনে বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন। জাগতিক দিক থেকে খুবই স্বচ্ছল ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে ধর্মসেবার অসাধারণ স্পৃহা সৃষ্টি করেন। ষাট বছর বয়সের পূর্বে তিনি পবিত্র কুরআন পড়তেন, কিন্তু এতটা নয়। কিন্তু এরপর বিশেষভাবে তিনি মনোযোগ দেন এবং খুব শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন পড়া শেখেন। এরপর অঙ্গীকার করেন, অবশিষ্ট জীবন ধর্মের সেবায় ব্যয় করবেন। যদিও তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন না। কিন্তু কার্যত তিনি সেই রূপ ধারণ করে দেখিয়েছেন যা ওয়াকেফে যিন্দেগীর চেয়েও বেশি ছিল। জামা'তের সেবা ও তবলীগে সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। এক বছরের মৌলিক শিক্ষা জামা'তের পক্ষ থেকে লাভ করেন, তাকে কনডেন্সড কোর্স (সংক্ষিপ্ত কোর্স) করিয়ে এরপর মোয়াল্লেম হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ২০১২ সালে নিজ শহরেই তাকে মোয়াল্লেম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। গান্টা শহরে তার নিজস্ব বাড়িও ছিল। এটিকে জামা'তের সেন্টার হিসেবে তিনি ওয়াকফ করেন। এই বাড়ির উঠোনেই তিনি ছোটো একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছেন। ধর্মসেবার কাজ করতেন। এভাবে তিনি নিম্বা কাউন্টির প্রথম মোবাল্লেগ হবার সম্মান অর্জন করেন। আমৃত্যু তিনি এখানেই সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। গান্টায় নিজের ব্যক্তিগত জমি জামা'তের মসজিদ ও মিশন হাউসের জন্য দান করেছেন, যার ওপর বর্ত মানে কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং রিজিওনাল মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত আছে। একইভাবে মনরোভিয়ার উপকণ্ঠে তিনি নিজের একটি প্লট এবং ছোটো একটি বাড়িও জামা'তকে দান করেন।

মরহুম জামা'তের সাথে সর্বদা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক রেখেছেন। এমনকি বৃদ্ধ ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ কাউন্টির প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়মিত ভ্রমণ করেছেন, যদিও রাস্তা কাঁচা এবং অত্যন্ত দুর্গম ছিল। তার তবলীগের প্রচেষ্টায় কিছু গ্রামও আহমদীয়াতের ছায়াতলে এসেছে। তিনি নামায, রোযা এবং নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন, নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন, গরিবদের দেখভাল করতেন। আর্থিক কুরবানীতে অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। পুণ্যবান এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি একজন মূসী ছিলেন। মৃত্যুর সময় তার ওসিয়্যতের হিসাব করা হলে দেখা যায়, প্রায় চার লাখ লাইবেরিয়ান ডলার অতিরিক্ত দিয়েছেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন।শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুইজন স্ত্রী ছাড়া তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার পরিবারের সদস্যদেরকেওজামা'তের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ সামিনা ভানু সাহেবার, যিনি লাইবেরিয়ার ডাক্তার ফযল মাহমুদভানু সাহেবের স্ত্রী ছিলেন; সম্প্রতি তিনিও মৃত্যুবরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মওলানা আব্দুর রহিম দার্দ সাহেবের দৌহিত্রি ছিলেন। দার্দ সাহেব এখানেও, অর্থাৎ যুক্তরাজ্যেও মুবাল্লেগ হিসেবে ছিলেন। মরহুমা রাবওয়া থেকে বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেন, অতঃপর লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে এম.এ সম্পন্ন করেন। প্রায় ৩৫ বছর যাবৎ আফ্রিকাতে নিজের ওয়াকেফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে সব ধরনের প্রতিকূলতার মোকাবেলা করে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে জীবনযাপন করেছেন এবং সর্বাবস্থায় দৃঢ় ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ওয়াকফের দায়িত্ব সানন্দেও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পালন করেছেন। দাম্পত্য জীবনেও ভালোবাসা এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তার এক নিকটাত্মীয় অর্থাৎ তার ভাবি তার সম্পর্কে লিখেছেন, সর্বদা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে দৃঢ় করার জন্য অর্থাৎ বংশের লোকজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। সবার সাথে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসা এবং প্রীতিময় সম্পর্ক রাখতেন।

ফ্রেঞ্চ ডেস্কের ইনচার্জ আব্দুল গনি জাহাঙ্গীর সাহেব লিখেছেন, [যেহেতু সামিনা সাহেবার স্বামী ফ্রান্সের অধিবাসী ছিলেন আর তার সাথে জাহাঙ্গীর সাহেবের সম্পর্ক ছিল, এ কারণে সামিনা সাহেবার সাথে তার (জাহাঙ্গীর সাহেবের) মায়ের বিশেষ সম্পর্ক ছিল]।

যাইহোক, তিনি বলেন, আমি একবার মরহুমাকে জিজ্ঞেস করি, ডাক্তার সাহেবের অবসরের পর আপনি কি পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া পছন্দ করবেন নাকি মরিশাসে? কেননা মরহুমার শ্বশুরবাড়ি ছিল মরিশাসে। তিনি (সামিনা সাহেবা) বলেন, না, আমি এখন আফ্রিকানই হয়ে গেছি; পাকিস্তানও না মরিশাসও না। আমি আফ্রি কায় থাকা পছন্দ করি আর আমি সর্বদা এখানেই থাকতে চাই। ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষি দেশসমূহে থাকার কারণে মরহুমা ফ্রেঞ্চ ভাষায় পারদর্শী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি (জাহাঙ্গীর সাহেব) বলেন, একবার মরহুমার শাশুড়ি সাহেবা আমাকে বলেন, সামিনা আমার সবচেয়ে প্রিয় পুত্রবধূ, কেননা সে স্বল্পে তু ষ্ট থাকে এবং কখনো অভিযোগ করে না। যদিও ডাক্তাররা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যেই থাকেন, তবুও কিছু কিছু জায়গায় ডাক্তারদের শুরুর দিকে আয় অনেক কম হয়ে থাকে, তখন সামান্য অর্থে ই জীবন অতিবাহিত করতে হয়। অথচ তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে স্বামীকে সঙ্গ দিয়েছেন এবং জীবন অতিবাহিত করেছেন। তার স্বামীও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ওয়াকফের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার শাশুড়ি বলেন, একবার মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে আসে; [মেয়েও এখন ডাক্তার হয়ে গিয়েছে আর সে-ও ওয়াকফ করেছে এবং হাসপাতালে সেবা দিয়ে যাচ্ছে, তার নাম আনিলা;] যাহোক, যখন সে স্কুল থেকে ফিরে আসে তখন স্কুলব্যাগটি ছেঁড়া ছিল। তখন নতুন ব্যাগ কিনে দেবার পরিবর্তে মরহুমা নিজের মেয়েকে বলেন, দাঁড়াও, আমি এটি ঠিক করে দিচ্ছি। আর তিনি নিজ হাতে সেলাই করে সেটি ঠিক করে দেন।

মরহুমা অত্যন্ত সহজসরল ও পাঁচবেলা নামাযে নিয়মিত, বিনয়ী, অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, স্নেহবৎসল ছিলেন;প্রত্যেকের খেয়াল রাখতেন; দোয়ায় অভ্যস্ত, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, মেহমানদের আপ্যায়নকারিণী, অত্যন্ত সদাচারিণী, দরিদ্র দের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন নারী ছিলেন। শুরুর দিকে যেসব মুরব্বী বুরকিনা ফাসোতে যেতেন তারা আমাকে লিখেছেন, আমরা যখন যেতাম তখন তিনি আমাদের অত্যন্ত খেয়াল রাখতেন এবং আমরা যারা একা ছিলাম তাদের খাবারের প্রতি তিনি সব সময় খেয়াল রাখতেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। মরহুমা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসীয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও একজন কন্যা রয়েছে। রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালে তার একজন ভাই আছেন ডাক্তার মাহমুদ আতেফ সাহেব। আরেকজন ভাই আছেন মুরব্বী সিলসিলা হামেদ মাকসুদ আতেফসাহেব।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা এবং দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়াবো।

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫)

❁****❁****❁****❁

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

যুগ খলীফার সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের সম্পর্ক

"খলিফা-ই-ওয়াক্তের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিস্তৃত প্রত্যেক আহমদির একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত পত্র আসে, যেখানে তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়াবলি উল্লেখ থাকে। প্রতিদিন যে পরিমাণ চিঠি আসে, কেবল সেগুলোই যদি দেখা হয়, তবে তা দুনিয়ার মানুষের কাছে একেবারেই অকল্পনীয় বলে মনে হবে। এই খিলাফতের ব্যবস্থাই বিশ্বের যে প্রান্তেই বসবাস করুক না কেন, প্রত্যেক আহমদির কষ্টের প্রতি মনোযোগ দেয়। খলিফা-ই-ওয়াক্ত তাঁদের জন্য দোয়া করেন।

আহমদিয়া জামাতের সদস্যরাই সেই সৌভাগ্যবান মানুষ, যাঁদের শিক্ষার বিষয়ে খলিফা-ই-ওয়াক্ত চিন্তিত থাকেন। তাঁদের স্বাস্থ্যের বিষয়েও তাঁর উদ্বেগ থাকে। বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্কসংক্রান্ত সমস্যাও থাকে। সংক্ষেপে বললে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা আহমদিদের এমন কোনো সমস্যা-তা ব্যক্তিগত হোক বা জামাতি-নেই, যার প্রতি খলিফা-ই-ওয়াক্তের দৃষ্টি পড়ে না এবং যার সমাধানের জন্য তিনি বাস্তব প্রচেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নত হয়ে দোয়া না করেন। আমিও তাই করি, এবং আমার পূর্ববর্তী খলিফাগণও এভাবেই করে এসেছেন।

দুনিয়ার এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে আমি রাতে ঘুমানোর আগে কল্পনায় পৌঁছাই না এবং যাদের জন্য ঘুমানোর সময়ও ও জাগ্রত অবস্থায়ও দোয়া না করি।"

(জুমআর খুতবা, ৬ জুন ২০১৪; প্রকাশিত: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ জুন ২০১৪, পৃ. ৭)

জুমআর খুতবা

আল্লাহর নামে এবং তাঁর পথে জেহাদ করো, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে; তবে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। শিশু ও নারীদের হত্যা করো না, এবং শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষ কামনা করো না। নিশ্চয়ই তোমরা জানো না–হতে পারে এর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। বরং এই দোয়া করো: "হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও, আমাদের জন্য তাদের মোকাবিলায় যথেষ্ট হয়ে যাও এবং তাদের যুদ্ধ আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দাও।" অতঃপর যদি সংঘর্ষ ঘটে যায় এবং তারা একত্রিত হয়ে হট্টগোল শুরু করে, তবে তোমাদের জন্য মর্যাদা ও নীরবতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না; নচেৎ তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের ভীতি ও প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই দোয়াও করো: "হে আল্লাহ! আমরা তোমার বান্দা, আর তারাও তোমারই বান্দা। আমাদের ও তাদের ললাট তোমারই ক্ষমতার অধীনে, এবং একমাত্র তুমিই আমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট।" আর জেনে রাখো–জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচে অবস্থিত।

"কাব ইবনু মালিক (রা.) এর ঘটনা অত্যন্ত শিক্ষণীয়। স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্যবস্থাপনা এক বিষয় এবং বাস্তব কাজ সম্পাদন আরেক বিষয়। শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে কেউ ভুল করলে তার কাছে জবাবদিহি করা হয়–সে যেই হোক না কেন। অতএব, আল্লাহর আদেশের অধীন থেকে দ্বীনের জন্য এমনভাবে চেষ্টা করো, যাতে শয়তান দূরে সরে যায়; কিন্তু কখনোই মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে তা করো না। আবার কাজ সম্পাদনের পর এ ধারণাও পোষণ করো না যে, তোমাদের ভুলের জন্য তোমাদের জবাবদিহি করা হবে না। আল্লাহর প্রতি কোনো অনুগ্রহ জাহির করো না, তিরস্কার বা কষ্ট দেওয়ার পথ অবলম্বন করো না। সব ধরনের উপায়ে ইসলামের সেবা করো।"

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (৫ নবুয়্যত, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,গত খুতবায় হযরত কা'ব বিন মালিক এবং অন্য কতক সাহাবীর তাবুক যুদ্ধ থেকে পেছনে রয়ে যাওয়া এবং এতে মহানবী (সা.)–এর অসন্তুষ্টির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল।

এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)–ও উল্লেখ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে জামা'তকে উপদেশও দিয়েছেন। তিনি বলেন,হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনজন মু'মিনও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। তাদের মধ্য থেকে একজনের দীর্ঘ বর্ণনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি অর্থাৎ সেই সাহাবী বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)–এর ফিরে আসার পর যখন আমি তাঁর কাছে পৌঁছি তখন আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করি, বলো তো, পেছনে রয়ে যাওয়া আর কেউ এসেছে কি না? আর তারা ক্ষমা চাওয়ার কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছে এবং তাদের সাথে কী আচরণ করা হয়েছে? তারা জানা য়, লোকেরা এসেই অজুহাত উপস্থাপন ও ক্ষমা প্রার্থনা করছে এবং বলছে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করুন। তিনি (সা.) তাদের জন্য দোয়া করে দিচ্ছেন। তিনি অর্থাৎ এই সাহাবী হযরত কা'ব বলেন, আমার মনে হলো, আমিও কোনো অজুহাত উপস্থাপন করে ভর্ৎসনা থেকে বেঁচে যাব। কিন্তু পরক্ষণেই আমার কিছু মনে হলো

এবং আমি সাহাবীদের জিজ্ঞেস করি, কারা কারা এসেছে? তারা যাদের নাম বলে তারা সবাই ছিল মুনাফিক। তারা মাত্র দু ইজন মু 'মিনের নাম বলে এবং জানায়, তারা কোনো অজুহাত উপস্থাপন করেন নি, বরং নিজেদের ভুল স্বীকার করেছেন। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি কেন মুনাফিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবো? যেগুলোকে প্রকৃতপক্ষে অপারগতা বলা চলে না– এমন অপারগতা উপস্থাপন করার চেয়ে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়াই শ্রেয় যে, ভুল হয়ে গেছে; আপনি আমার বিষয়ে যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত প্রদান করুন। সুতরাং এই চিন্তা আসার পর আমি অপরাধ স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিই এবং এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। বস্তুত আমি যাই এবং মহানবী (সা.)–কে স্পষ্টভাবে বলে দিই যে, আমার অলসতা ও উদাসীনতার কারণেই আমি যুদ্ধে অংশ নিই নি, নতুবা কোনো প্রকৃত অপারগতা ছিল না। এর প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) বলেন, যতক্ষণ না আল্ল াহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তোমার ব্যাপারে কোনো নির্দেশ আসছে, তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হবে। এই সাহাবীর নাম ছিল কা'ব বিন মালিক। তিনি বর্ণনা করেন, এই নির্দেশে আমি চরম কষ্ট পাই। কারণ মদীনায় সবাই মুসলমানই ছিল, আর যারা মুনাফিক ছিল তাদের মধ্য থেকেও কারো এদের সাথে কথা বলার সাহস ছিল না।

[এই পুরো ঘটনা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম, বিস্তারিত গত খুতবায় বর্ণনা করেছি।] তিনি (রা.) খুতবায় এই ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে, যেমনটি আমি বলেছি, জামা'তকে উপদেশও দিয়েছিলেন। তিনি অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখানে অর্থাৎ কাদিয়ানে তো আমি দেখেছি, [এটি ১৯৩৬ সালের কথা;] যাদের সাথে কথাবার্তা বলা নিষেধ, অর্থাৎ যারা শাস্তিপ্রাপ্ত, তারা পাড়ামহল্লায় আহমদীদের বাড়িতেও চলে যায়। মহল্লাবাসীরা হয়ত ঘুমিয়ে থাকে আর তারা টেরই পায় না। এখানকার কোনো কোনো আহমদী সাপ পুষছে! কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত, এই সাপগুলো আল্লাহ্ কেও দংশন করতে পারবে,কিংবা তাঁর রসূলকে বা খলীফাকেও দংশন করতে পারবে না। এরা তাদেরকেই দংশন করবে যারা এদের পোষে। আমরা তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিরাপদ। কারণ আল্লাহ্ তা'লা যাকে নিজের নিরাপত্তায় নিয়ে নেন, তাকে কে দংশন করতে পারে? এরা তাদেরকেই দংশন করবে যাদের তারা দংশন করতে সক্ষম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এই সাপগুলোর কর্মকাণ্ডকে দেখার পরও তারা উপেক্ষা করে।

সেই সময়ে কিছু নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল যার কারণে তাঁকে (রা.) একথা বলতে হয়েছিল। এরপর তিনি আরো বলেন, মোটকথা মদীনায় কোনো মুনাফিকও তাদের সাথে কথা বলতে পারত না। হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, এই নির্দেশের কয়েকদিন পর জানা যায়, মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, স্ত্রী –সন্তানরাও যেন এই লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। আমাদের তিনজনের মধ্যে একজন সাহাবী বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রসূলে করীম (সা.)–এর কাছে যান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার স্বামী তো আগেই মৃতপ্রায় হয়ে আছেন; খাওয়াদাওয়াও করেন না, ঘুমানও না। তাছাড়া অতি বৃদ্ধ হবার কারণে সব সময় সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকেন। স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্কের যোগ্য তো তিনি পূর্বেই ছিলেন না। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমি খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারি। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, এতটুকু অনুমতি আছে। হযরত কা'ব বলেন, এতে আমার মনে হলো, আমিও কেন নিজের জন্য এমন অনুমতির ব্যবস্থা করি না? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, তিনি বৃদ্ধ, আর আমি যুবক; আমার জন্য এমনটা করা সমীচীন নয়। তাই আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও। এমন যেন না হয় যে, আমি তোমাকে ডাকলে তুমি উত্তর দিয়ে বসবে। অন্য কারও সম্পর্কে তো আমার এই ধারণা ছিলই না যে, সে আমার সাথে কথা বলবে। হ্যাঁ, মহানবী (সা.) –এর ভালোবাসা ও মমতার কারণে এই ধারণা ছিল যে, আমার কষ্ট দেখে তাঁর নিশ্চয়ই দয়া হবে। তাই আমি তাঁর মজলিসে যেতাম এবং উঁচু গলায় 'আসসালামু আলাইকুম' বলতাম। এরপর দেখতাম– তাঁর (সা.) ঠোঁট নড়ে কি না; কিন্তু তিনি উত্তর দিতেন না। আমি অস্থির হয়ে উঠে আসতাম এবং ভাবতাম, হয়ত তাঁর ঠোঁট নড়েছিল, কিন্তু আমি দেখতে পাই নি। তাই তখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতাম এবং পুনরায় ফিরে এসে উঁচু গলায় 'আসসালামু আলাইকুম' বলে আবারও তাঁর ঠোঁটের দিকে তাকাতাম। আবার উঠে আসতাম, আবার যেতাম, কিন্তু তিনি (সা.) উত্তর দিতেন না। তবে আড়চোখে কখনো কখনো আমার দিকে তাকাতেন। তিনি বলেন, যখন অনেক দিন

কেটে যায়, তখন আমি আমার এক চাচাতো ভাইয়ের কাছে যাই, যার সাথে আমি সবসময় খাওয়াদাওয়া ও ওঠাবসা করতাম। সে তার বাগানে কাজ করছিল। আমি তাকে বললাম, হে আমার ভাই! তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা দু ইজন সবসময় একসাথে থেকেছি এবং আমাদের কোনো কথা একে অপরের কাছে গোপন নেই। তুমি ভালো করেই জানো, আমি একজন একনিষ্ঠ মুসলমান এবং কপটতার কোনো লেশ আমার মধ্যে নেই। আজ আমি অস্থির হয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি; বলো তো, আমি কি মুনাফিক? কিন্তু সে কোনো উত্তর দেয় নি আর শুধু আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকায়, যার অর্থ ছিল– আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূ লই ভালো জানেন।তিনি বলেন, যখন এমন ভাই– যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, সে আমাকে এই উত্তর দেয়– তখন আমার মনে হলো, পৃথিবী আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। আর আমি অস্থির হয়ে বাগানের দেয়াল টপকে বাইরে চলে আসি এবং পাগলের মতো শহরের দিকে যেতে থাকি। যখন শহরের কাছে পৌঁছি, তখন এক ব্যক্তি আমার কাছে আসে এবং জিজ্ঞেস করে, তুমি কি অমুক ব্যক্তি? আমি বলি, হ্যাঁ। তখন সে আমাকে একটি চিঠি দেয় এবং বলে, এটি অমুক বাদশা পাঠিয়েছে। সে ছিল আরবের এক খ্রিষ্টান বাদশা, যে রোম সরকারের অধীনস্থ ছিল। আমি চিঠিটি খুলে পাঠ করি। তাতে লেখা ছিল: আমরা জানি, তুমি আরবের একজন নেতা; অথচ মুহাম্মদ (সা.) তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন, যদিও তোমার কদর করা উচিত ছিল। তুমি যদি আমার কাছে চলে আসো, তবে আমি তোমার মর্যাদানুযায়ী তোমার সাথে ব্যবহার করব।(কা'ব বিন) মালিক বলেন, আমার ভাই আমাকে যে জবাব দিয়েছিল, অর্থাৎ যখন চাচাতো ভাইয়ের বাগানে গিয়েছিলাম তাতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। [অর্থাৎ সেই সময়েও প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল।] এই চিঠি দেখে আমার বজ্রাহতের মতো অবস্থা হলো। আমি ভাবলাম, এটি শয়তানের শেষ আক্রমণ। এই পরিস্থিতিতে আমার যেন পদস্খলন না ঘটে। আমি সেই দূতকে বলি, আমার সাথে এসো। এক স্থানে একজন উনুন জ্বালাচ্ছিল। আমি চিঠিটি টুকরো টুকরো করে সেই আগুনে ফেলে দেই এবং তাকে বলি, তোমার বাদশাকে বলে দিও, এটিই তার (চিঠির) উত্তর। এটি ছিল তার পরীক্ষা ও বিপদের চূড়ান্ত মুহূর্ত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা করুণা করেন এবং মহানবী (সা.) –কে বলেন, তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হোক।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড–১৭. পৃ: ৬৫৫–৬৫৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক জায়গায় বলেন, কা'ব বিন মালিক (রা.)–র ঘটনাটি কতই–না শিক্ষণীয়!তিনি সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)–এর সহযোদ্ধা ছিলেন এবং মক্কা বিজয়েও তাঁর সাথে ছিলেন, কিন্তু অলসতার কারণে তাবুকের যুদ্ধে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে এমন কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন যে, তার সালামের উত্তর পর্যন্ত দিতেন না; সকল মুসলমানকে (তার সাথে) কথা বলতে বারণ করে দেন, এমনকি তার স্ত্রীকেও (তার কাছথেকে) আলাদা করে দেন। এমন পরিস্থিতিতে গাস্সানের বাদশার দূত তার কাছে চিঠি নিয়ে আসে, যার মাঝে লেখা ছিল, তোমার নেতা তোমার মূল্যায়ন করেন নি, তাই তুমি আমার কাছে চলে আসো। তিনি বলেন, এটি শয়তানের চূড়ান্ত আক্রমণ! একথা বলে তিনি চিঠিটি তন্দুর বা উনুনে নিক্ষেপ করেন এবং দূতকে বলেন, এই বার্তাটি তোমার বাদশাকে পৌঁছে দিও। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তের সেই যুগের অবস্থার প্রেক্ষিতে বলেন, কিন্তু বর্তমান সময়ের মানুষএমন– যদি কাউকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বা কৈফিয়ত তলব করা হয়, উত্তরে তারা বলে, আমাদের সেবার কথা বিবেচনা করা হয় নি, আমাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় নি।

স্মরণ রাখা উচিত, ব্যবস্থাপনা এক বিষয় আর সেবা করা ভিন্ন বিষয়। ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যদি কেউ ভুল করে তাহলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তা সে যে–ই হোক না কেন। সুতরাং আল্লাহ্র নির্দেশের আলোকে ধর্মের জন্য এমনভাবে চেষ্টা প্রচেষ্টা করো যেন শয়তানকে বিতাড়িত করতে পারো। কিন্তু কখনোই প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষায় কাজ কোরো না, আর সেবা করে এটি ভেবো না যে, আমাদের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আর আল্লাহ্র সমীপে (নিজেদের সেবার) বড়াই কোরো না, অনুগ্রহ করেছ বলে খোঁটা দিও না। সর্বতোভাবে ইসলামের সেবা করো। (খুতবাতে মাহমুদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫২৭–৫২৮)

অনুগ্রহের খোঁটা দিও না বরংসেবা করে যাও; আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য এই চেতনাই থাকা উচিত।

এটি ছিল খিলাফতের শুরুর দিকের খুতবাগুলোর একটি উদ্ধৃতি; প্রথম উদ্ধৃতিটি ছিল ১৯৩৬ সালের।

তাবুকের যুদ্ধাভিযান এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বরকতময় সফর সাব্যস্ত হয় যে, গোটা আরব ভূখণ্ডে মুসলমানদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র আরব জুড়ে ইসলামের পতাকা উড়তে আরম্ভ করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কেও বলেছেন। তিনি বলেন, "তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে তায়েফবাসীরাও এসে বশ্যতা স্বীকার করে। [পূর্বে তারা যুদ্ধ করছিল, এরপর তারা আনুগত্য বরণ করে।] এরপর আরবের অন্যান্য গোত্রও পালাক্রমে এসে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র আরব জুড়ে ইসলামী পতাকা উড়তে আরম্ভ করে।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড–২০, পৃ: ৩৬৩)

ফিরে আসার পর একটি সেনাভিযানও হয়েছিল, যাকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের অভিযান বলা হয়, যা নাজরানে বনু হারিস বিন কা'ব গোত্রের শাখা বনু আব্দুল মাদান অভিমুখে ছিল।

যার নামে এই গোত্রের নামকরণ করা হয়েছিল, সেই আব্দুল মাদান ছিল বনু হারিস গোত্রের পূর্বপুরুষ এবং তার নাম ছিল আমর বিন ইয়াযীদ। ইবনে সা'দের রেওয়ায়েত অনুসারে, এই অভিযানটি দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। যদিও ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী, এই অভিযানটি দশম হিজরীর রবিউল আখের বা জমাদিউল আউয়ালে সংঘটিত হয়েছিল। সীরাত খাতামান নবীঈন (সা.) পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নাজরান অভিমুখে খালিদ বিন ওয়ালীদের অভিযানের তারিখ দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল বলে উল্লেখ করেছেন। (ইবসে সাআদ রচিত আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৮)

যাইহোক, এর বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.)–কে নির্দেশ দেন, যুদ্ধের পূর্বে তিনবারএদেরকে, অর্থাৎ যাদের উদ্দেশ্যে এই সেনাভিযান প্রেরিত হয়েছিল– তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা যদি (ইসলাম) গ্রহণ করে তাহলে উত্তম, অন্যথায় যুদ্ধ করবে। অর্থাৎ তারা যদি যুদ্ধ করার চেষ্টা করে তবুও তুমি তাদেরকে তিনবার ইসলামের শিক্ষার প্রতি আহ্বান জানাবে। এরপরও যদি যুদ্ধ করতে চায় তাহলে ঠিক আছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। হযরত খালিদ (রা.) তদ্রুপই করেন এবং এরা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর হযরত খালিদ (রা.) তাদের মাঝে অবস্থান করেন; [অর্থাৎ কোনো যুদ্ধ হয় নি; তিনি কেবল তাদের তবলীগ করেন এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়।] হযরত খালিদ (রা.) তাদের মাঝে অবস্থান করেন এবং তাদেরকে ইসলাম, আল্লাহ্র কিতাব এবং মহানবী (সা.)–এর সুন্নতের শিক্ষা দিতে শুরু করেন, আর মহানবী (সা.)–ও হযরত খালিদ (রা.)–কে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন।

এরপর হযরত খালিদ (রা.) মহানবী (সা.)–এর সমীপে একটি পত্র প্রেরণ করেন এবং লেখেন: আল্লাহ্র রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর সমীপে খালিদ বিন ওয়ালীদের পক্ষ থেকে। আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহি ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সেই আল্লাহ্র গুণকীর্তন করি যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। পর সমাচার, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রতি আশিস বর্ষণ করুন! আপনি আমাকে বনু হা রিস অভিমুখে পাঠিয়েছিলেন এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি যেন তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাই। এরপর তারা যদি ইসলামগ্রহণ করে, তাহলে আমি যেন তাদের মাঝে থেকে তাদেরকে ইসলামের বিধান, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)–এর সুন্নত শিক্ষা দিই। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে আমি যেন তাদের সাথে যুদ্ধ করি।

কিছু বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয় না, কিংবা অন্য স্থানে কিছু কথার সাথে মিলে যায়। কিন্তু বলপ্রয়োগ করে ইসলাম গ্রহণ করানো আদৌ ইসলামের শিক্ষা নয়। (একথা বলার) উদ্দেশ্য এটিই ছিল যে, যদি তারা কোনো চুক্তি না করে অথবা এরপরও যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে তোমাদের তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি আছে। তিনি (রা.) বলেন, আমি তাদের কাছে আসি এবং আপনার নির্দেশ অনুসারে তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেই এবং অশ্বারোহীদেরকে তাদের কাছে (এ বার্তাসহ) প্রেরণ করি যে, 'হে বনু হারিস! ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপদ থাকবে।' ফলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। [তিনি তবলীগ করেন, ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এই বাক্য থেকে এটিও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলেন, কেননা তারা যুদ্ধের জন্য প্রথমে আক্রমণ করে নি। প্রতিপক্ষ যেহেতু আক্রমণ করে নি, তাই এরাও (তথা মুসলমানরাও) যুদ্ধ করতে যান নি; তবলীগ করতে গিয়েছিলেন, তা–ই করেন।] এরপর তিনি (রা.) লেখেন: এখন আমি তাদের মাঝে অবস্থান করছি এবং ধর্মের আদেশ–নিষেধ ও বিধিবিধান সম্পর্কে তাদের অবহিত করছি। আগামীতে আপনার পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসবে, আমি সে অনুযায়ী কাজ করব। ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহি ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.)–র এই পত্রের উত্তরে বলেন: বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ (সা.)–এর পক্ষ থেকে খালিদ বিন ওয়ালীদের প্রতি সালাম। আমি সেই আল্লাহ্র গুণকীর্তন করি যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। পর সমাচার, দূত মারফত তোমার পত্র আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং জানতে পারলাম, বনু হারিস ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যুদ্ধের পূর্বেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমার সাক্ষ্য দিয়েছে। আর এটি আল্লাহ্র হিদায়াত যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন। অতএব, তুমি তাদেরকে আল্লাহ্র পুরস্কারের সুসংবাদ দাও এবং ঐশী শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করো। আর তাদের কয়েকজনকে তোমার সাথে নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও। ওয়াসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হযরত খালিদ (রা.) এই নির্দেশনা পেয়ে বনু হারিসের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হন। যাদেরকে তিনি সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাদের নাম হলো, কায়েস বিন হুসাইন, ইয়াযীদ বিন আব্দুল মাদান,

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" **(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)**

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

ইয়াযীদ বিন মুয়াজ্জাল, আব্দু ল্লাহ্ বিন কুরাদ, শাদাদ বিন আব্দু ল্লাহ্, আমর বিন আব্দুল্লাহ্। এই লোকেরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) তাদের দেখে বলেন, এরা কারা? দেখে মনে হচ্ছে, এরা হিন্দি (তথা ভারতীয়) লোক। নিবেদন করা হয়, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এরা বনু হারিস গোত্রের সদস্য। এই লোকেরা মহানবী (সা.)-কে সালাম দেয় এবং বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র রসূল এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। মহানবী (সা.) বলেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্য নাই এবং নিঃসন্দেহে আমি তাঁর রসূল। অতঃপর রসূলু ল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরাই কি সেসব লোক যারা নিজেদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ হলেইতাদের (পরাজিত করে) তাড়িয়ে দাও? লোকেরা নীরব থাকে, তাদের মাঝে কেউ অগ্রসর হয় নি, অর্থাৎ কথা বলে নি। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) কথাটির পুনরাবৃত্তি করেন, তবুও লোকেরা নীরব থাকে। তাদের মাঝে কেউ অগ্রসর হয় নি, কেউ উত্তর দেয় নি। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) তৃতীয়বার কথাটির পুনরাবৃত্তি করেন। তাদের মাঝে কেউ অগ্রসর হয় নি, এমনকি মহানবী (সা.) চতুর্থবার পুনরাবৃত্তি করেন যে, যখনই শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করো তখন তাদেরকে তাড়িয়ে দাও। অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে অনেক শক্তিশালী মনে করতে। তখন ইয়াযীদ বিন আব্দুল মাদান নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্ররসূল! জি, আমরাই সেসব লোক, যারা কারো সাথে যুদ্ধ হলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতাম। [আর তিনিও চারবার একথা নিবেদন করেন।] আমরা যুদ্ধবাজ এবং সাহসী ছিলাম; কিন্তু এখানে (স্বাভাবিকের) বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ- এ কথা যদি খালিদ আমাকে না লিখত, তাহলে আমি তোমাদের মাথাগুলো তোমাদের পদতলে নিক্ষেপ করতাম। ইয়াযীদ বিন আব্দুল মাদান নিবেদন করেন, আমরা আপনার অথবা খালিদের প্রতি কৃতজ্ঞ নই। [নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।] তিনি বলেন, আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ নই। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তবে তোমরা কার প্রতি কৃতজ্ঞ? তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি আমাদেরকে আপনার মাধ্যমে হিদায়াত দিয়েছেন। [তিনিও সুন্দর উত্তর দিয়েছেন।]রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তুমি সত্য বলছ। এরপর তিনি (সা.) বলেন, এটা ব লো যে, তোমরা কোন কারণে অজ্ঞতার যুগে নিজেদের বিরোধীদের ওপর জয়যুক্ত হতে ? তখন তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা সম্মিলিতভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম। [তারা মনে করত, আমরা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করব, তাহলে আমরা অবশ্যই জয়যুক্ত হব; আমাদের ওপর কেউ জয়যুক্ত হতে পারবে না।] যখন ইসলাম আসল এবং ইসলাম সকল গোত্রকে একতাবদ্ধ করল এবং বিভিন্ন গোত্র একটি প্রাণের ন্যায় হয়ে গেল, তখন তারা বুঝতে পারল, এরাও একতাবদ্ধ আর এদের সাথে যুদ্ধ না করাই মঙ্গল। বরং শুধু যুদ্ধ করব না- তা নয়, বরং ইসলামও গ্রহণ করে নিই, কেননা এটাই সত্য ধর্ম।

হুযূর (সা.) কায়েস বিন হুসাইনকে বনু হারিসের আমীর নিযুক্ত করেন আর শাওয়াল মাসের শেষে অথবা যুল কা'দার শুরুতে তাদের বিদায় দেন। লোকেরা নিজ জাতিতে পৌঁছানোর চার মাস পর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তিরোধন হয়।

(আসসীলাতুন নববীয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৬১-৮৬৩)

মহানবী (সা.)-এর শেষ যুদ্ধাভিযান ছিল তাবুকের যুদ্ধাভিযান। আর শেষ সেনা অভিযান বা সারিয়্যা যা তিনি (সা.) প্রেরণ করেছিলেন তা ছিল উসামার সেনাদল। উসামার সেনাদলের বিস্তারিত আলোচনা সেটির বিবরণে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র বিবরণে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবুও প্রাসঙ্গিকতার কারণে সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করে দিচ্ছি।

বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) লোকদেরকে হযরত যায়েদ, হযরত জাফর এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার (রা.) মৃত্যুসংবাদ দেন, আর তা লোকদের কাছে তাদের সংবাদ পৌঁছানোর পূর্বেই দেন। তিনি (সা.) বলেন, যায়েদ (রা.) পতাকা নিলেন। [এর পূর্বে অর্থাৎ উসামার সেনাদলের পূর্বে ও একটি সেনাদল গিয়েছিল।] তিনি পতাকা নিলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর জাফর (রা.) পতাকা নিলেন এবং তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর ইবনে রওয়াহা (রা.) পতাকা নিলেন এবং তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। [তাঁর (সা.) চোখ থেকে তখন অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি বলেন,] শেষে আল্লাহ্র তরবারির মধ্য থেকে একটি তরবারি খালিদ বিন ওয়ালীদ পতাকা নিলেন, এমনকি আল্লাহ্ তাকে শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করলেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৫৭)

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন মহানবী (সা.) মদীনা মুনাওয়ারায় ফেরত আসেন, সে সময় দক্ষিণ দিক থেকে মদীনাবাসীদের কোনো শত্রুর ভয় অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু উত্তর দিকে রোমানদের পক্ষ থেকে তখনও পর্যন্ত আশঙ্কা রয়ে গিয়েছিল। কেননা সেখানকার খ্রিষ্টানরা নিজেদের শক্তিমত্তা নিয়ে খুব গর্ব করত, তাই যে-কোনো মুহূর্তে তাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। এমনিতেও মুতার যুদ্ধের শহীদদের প্রতিশোধ নেওয়া তখনও বাকি ছিল,যদিও হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র দক্ষতার কারণে সেই যুদ্ধ থেকে মুসলিম সেনাদল মদীনায় ফেরত আসতে সক্ষম হয়েছিল।

বিদায় হজ্জ পালন শেষে মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসার পর বেশি দিন হয় নি, এর কিছুদিন পরই হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-র নেতৃত্বে একটি সেনাদলকে সিরিয়া আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন।

(মহম্মদ হোসেন হাইকাল রচিত 'হায়াতে মহম্মদ' পৃ: ৫৯৭)

হযরত উসামা (রা.)-র সেনাদলের প্রস্তুতি মহানবী (সা.)-র মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে শনিবার সম্পন্ন হয় আর তাঁর অসুস্থতার পূর্বেই এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। তিনি (সা.) সফর মাসের শেষে রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতির আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) হযরত উসামা (রা.)-কে ডেকে বলেন, তোমার পিতার শাহাদাতের স্থান অভিমুখে যাত্রা করো; [অর্থাৎ প্রথম যুদ্ধে হযরত যায়েদ (রা.)-কে যেখানে শহীদ করা হয়েছিল, তিনি (সা.) সেখানে যেতে বলেন;] আর গিয়ে ঘোড়া দিয়ে তাদের অর্থাৎ শত্রুদের পিষে ফেলো। আমি তোমাকে এই সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করছি। (ফাতহুল বারি লি ইবনে হাজার, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৯২)

অপর একটি রেওয়ায়েতের বর্ণনামতে মহানবী (সা.) বলেন, বালকা এবং দারুমকে ঘোড়া দিয়ে পিষ্ট করো। [বালকা সিরিয়ায় অবস্থিত একটি এলাকা যা দামেস্ক ও ওয়াদিউল কুরার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। দারুম হলো মিশর যাওয়ার পথে ফিলিস্তিনের গাজার পর একটি জায়গা।] আর সিরিয়ার অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি (সা.) বলেন, সকাল হওয়ার সাথে সাথে উবনাবাসীদের ওপর আক্রমণ করো। [উবনা সিরিয়ায় বালকা অভিমুখে একটি জায়গার নাম।] আর তিনি (সা.) বলেন, দ্রুততার সাথে সফর করো যেন তাদের (তথা শত্রুদের) কাছে সংবাদ পৌঁছার পূর্বেই পৌঁছাতে পারো। আর আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সফলতা দান করলে সেখানে অবস্থান সংক্ষিপ্ত রাখবে। আর পথপ্রদর্শকদের সাথে নিয়ে নেবে এবং পথপ্রদর্শক ও গোয়েন্দাদের অগ্রে প্রেরণ করবে। মহানবী (সা.) হযরত উসামা (রা.) -র জন্য স্বহস্তে একটি পতাকা প্রস্তুত করেন, অতঃপর বলেন, "আল্লাহ্র নামে তাঁর পথে জিহাদ করো এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ্ কে অস্বীকার করে। আর ধোঁকা দেবে না, শিশু ও নারীদেরকে হত্যা করবে না এবং শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করবে না।

[এই বাক্যাংশটি শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রতি ইঙ্গিত করছে; শত্রু যদি আক্রমণ করে তবেই তোমরা যুদ্ধ করবে, কিন্তু তোমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করবে না।] তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা জানো না; হতে পারে, এ কারণে তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে; কিন্তু তোমরা এই দোয়া করো যে, হে আল্লাহ্ !তুমি যেভাবে চাও সেভাবে তাদের (তথা শত্রুদের) বিরুদ্ধে আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও আর তাদের যুদ্ধকে আমাদের থেকে দূর করে দাও। "

[তিনি (সা.) এই দোয়াও শিখিয়েছেন যে, যুদ্ধ আবশ্যক নয়; যদি যুদ্ধ এড়ানো যায় তবে এড়িয়ে যাও।]

কিন্তু এরপরও যদি তাদের সাথে যুদ্ধ হয় আর তারা একত্র হয়ে হইচই করে তবে তোমার জন্য আবশ্যক হলো আত্মমর্যাদা ও নীরবতা বজায় রাখা। [অর্থাৎ নীরবতা ও আত্মমর্যাদার সাথে যুদ্ধ করবে।] আর তোমরা পরস্পর ঝগড়া করবে না, নতুবা তোমরা ভীতু হয়ে যাবে আর তোমাদের প্রভাব ও ত্রাস নিঃশেষ হয়ে যাবে। [নিজেদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করো।] আর তোমরা দোয়া করো, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার বান্দা আর তারাও তোমার বান্দা। আমাদের ও তাদের ভাগ্য তোমার হাতে আর তুমিই তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট হতে পারো। আর তোমরা জেনে রাখ! তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত রয়েছে।

হযরত উসামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর হাতে প্রস্তুত করা পতাকা নিয়ে রওয়ানা হন এবং সেটিকে হযরত বুরাইদা বিন হুসাইব (রা.)-কে প্রদান করেন আর জুরফ নামক স্থানে সৈন্যসমাবেশ করেন। জু রফ মদীনা থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি স্থান। আনসার ও মুহাজিরদের সকল সম্মানিত ব্যক্তিকে এই যুদ্ধে যোগদানের জন্য ডাকা হয়। তাদের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত কাতাদা বিন নু'মান, হযরত সালামা বিন আসলাম প্রমুখ অর্ন্তভুক্ত ছিলেন; সকলকে হযরত উসামা (রা.)-র অধীনস্থ করা হয়েছিল। কতক লোক কথা বলা শুরু করে দেয় আর তারা বলে, এই ছেলেকে প্রাথমিক যুগের মুহাজিরদের ওপর আমীর নিযুক্ত করা হচ্ছে! [এখানে বড়ো বড়ো মুহাজির সাহাবী রয়েছেন, তা সত্ত্বেও এই ছেলেটিকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে!] মহানবী (সা.) যখন এসব কথা জানতে পারেন তখন ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। তিনি (সা.) মাথায় একটি রুমাল বেঁধে রেখেছিলেন এবং গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) মিম্বরে আরোহণ করেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন।

এরপর বলেন, "হে লোকসকল! উসামাকে আমীর বানানোর কারণে তোমাদের অনেকের কানাঘুষার কথা আমি জানতে পেরেছি। আমি উসামাকে আমীর বানানোর কারণেই যে কেবল তোমরা এখন আপত্তি করছ- তা নয়; বরং তার পূর্বে তার পিতাকে আমীর নিযুক্ত করার কারণেও তোমরা আপত্তি তুলেছিলে। আল্লাহ্র কসম! সে-ও (রা.) আমীর হিসেবে যোগ্য ছিল এবং তার পরে তার পুত্রও আমীর হওয়ার যোগ্য। সে তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

আমার সবচেয়ে প্রিয়জন, আর নিশ্চয় এরা উভয়ে এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যাদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার সৎকাজ ও পুণ্যকর্মের ধারণা করা যেতে পারে। কাজেই উসামা (রা.) সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করো, কেননা সে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তিদের একজন।

যে-সব মুসলমান হযরত উসামা (রা.)-র সাথে রওয়ানা হচ্ছিল তারা মহানবী (সা.)-কে বিদায় জানিয়ে জুরফ নামক স্থানে সেনাদলে যোগদান করার উদ্দেশ্যে চলে যেত। (ইতোমধ্যে) মহানবী (সা.)-এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়, তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) জোর দিয়ে বলতে থাকেন যে, উসামার সেনাদলকে পাঠিয়ে দাও, তারা অবশ্যই যাবে। রবিবার দিন মহানবী (সা.)-এর কষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়। হযরত উসামা (রা.) সেনাদল থেকে ফেরত আসেন। সে মুহূর্তে তিনি (সা.) অচেতন অবস্থায় ছিলেন। [অসুস্থতা বেড়ে যাবার সংবাদ পেয়ে তিনি (রা.) ফিরে আসেন।] সেদিন লোকজন তাঁকে (সা.) ঔষধ সেবন করিয়েছিল। [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে ঔষধ খাইয়েছিল।] হযরত উসামা (রা.) মাথা ঝুঁকিয়ে মহানবী (সা.)-কে চুম্বন করেন। মহানবী (সা.) তখন কথা বলতে পারছিলেন না, কিন্তু তাঁর দুহাত আকাশপানে তুলছিলেন আর হযরত উসামার মাথায় রাখছিলেন। হযরত উসামা (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারি- তিনি (সা.) আমার জন্য দোয়া করছেন। হযরত উসামা (রা.) সেনাদলের মাঝে ফিরে যান। সোমবার হযরত উসামা (রা.) পুনরায়মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন, তখন তিনি (সা.) সুস্থ বোধ করছিলেন। তিনি (সা.) হযরত উসামা (রা.)-কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা সহকারে যাত্রা করো। হযরত উসামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ সেনাদল অভিমুখে যাত্রা করেন এবং অন্যদেরও যাত্রা করার নির্দেশ দেন। তিনি যাত্রা আরম্ভ করতে উদ্যত হতেইতার অর্থাৎ হযরত উসামার (রা.) মা হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-র পক্ষ থেকে জনৈক ব্যক্তি বার্তা নিয়ে আসে যে, মহানবী (সা.) জীবনের অন্তিম মুহূর্ত অতিক্রম করছেন বলে মনে হচ্ছে। একথা শুনে হযরত উসামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হন, হযরত উমর ও হযরত আবু উবায়দাও তার সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.) অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন , যে কারণে মুসলমান সেনাদল জুরফ নামক স্থান থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করে আর হযরত বুরাইদা বিন হুসাইব (রা.) হযরত উসামা (রা.)-র পতাকা নিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর দরজার পাশে গেড়ে দেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হযরত উসামা (রা.)-র সেনাদল যখন যু-খুশুব নামক স্থানে ছিল তখন মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন।

যু-খুশুবও মদীনা থেকে সিরিয়া অভিমুখে এক রাতের দূরত্বে অবস্থিত। এটি একটি উপত্যকা। মোটকথা তারা ফিরে আসেন।

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরে লোকেরা যখন হযরত আবু বকর (রা.)-র হাতে বয়আত সম্পন্ন করে তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত বুরাইদা বিন হুসাইব (রা.)-কে আদেশ দেন, পতাকা নিয়ে তুমি হযরত উসামা (রা.)-র বাড়ি যাও যেন তিনি (রা.) স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে যাত্রা করেন। হযরত বুরাইদা (রা.) পতাকাটি সেনাদলের পূর্বোক্তস্থানে নিয়ে আসেন।

(তারিখে তাবারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৪) (সুবুলুল হুদা আল রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৪৮) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০১)

এই সেনাদলের সংখ্যা তিন হাজার বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যার মাঝে এক হাজার অশ্বারোহী ছিলেন। আর অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে সাতশ সৈন্যসহ সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করা হয়েছিল। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরের দিন হযরত আবু বকর (রা.) ঘোষণা করিয়ে দেন, উসামার অভিযান পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হবেই। উসামার সেনাদলের কোনো একজন সদস্যওযেন মদীনায় না থাকে, বরং তারা সবাই যেন জুরফ-এ গিয়ে তার সেনাদলের সাথে যুক্ত হয়।(তারিখে তাবারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন সমগ্র আরব মুরতাদ হয়ে যায় আর হযরত উমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-র ন্যায় সাহসী ব্যক্তিও এই নৈরাজ্য দেখে ঘাবড়ে যান। মহানবী (সা.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রোমান এলাকায় আক্রমণের জন্য একটি সেনাদল প্রস্তুত করেছিলেন এবং হযরত উসামা (রা.)-কে এর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এই সেনাদল রওয়ানা হবার পূর্বেই মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুতে যখন সমগ্র আরব মুরতাদ হয়ে যায় তখন সাহাবীগণ মনে করেন, যদি এরূপ বিদ্রোহপূর্ণ অবস্থায় হযরত উসামা (রা.)-র সেনাদলকে রোমানদের এলাকায় আক্রমণের জন্য প্রেরণ করা হয় তাহলে মদীনায় কেবলমাত্র বৃদ্ধ পুরুষ, শিশু ও নারীরাই থেকে যাবে এবং মদীনার নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থাই থাকবে না। তাই তারা প্রস্তাব দেয় যে, বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের একটি প্রতিনিধিদল হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে যাবে এবং তাঁর নিকট নিবেদন করবে, তিনি (রা.) যেন নৈরাজ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সেনাদলের যাত্রা স্থগিত রাখেন। অতএব হযরত উমর (রা.) ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ সাহাবী তাঁর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁরা নিবেদন করেন, বিদ্রোহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন এই সেনাদলের যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এই কথা শোনেন তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে সেই প্রতিনিধিদলকে এই উত্তর প্রদান করেন যে, তোমরা কি এটি চাও- মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আবু কুহাফার পুত্র [অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)] সর্বপ্রথম কাজ এটি করবে যে, যে সেনাদলকে মহানবী (সা.) যাত্রা করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন- সেটিকে যাত্রা করা থেকে বিরত রাখবে? এরপর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ র কসম! শত্রুপক্ষের সেনারা যদি মদীনায় প্রবেশও করে ফেলে এবং কুকুর মুসলমান নারীদের মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়, তবুও আমি এই সেনাদল প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকব না যেটিকে মহানবী (সা.) প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সাহসিকতা ও বীরত্ব হযরত আবু বকর (রা.)-র মধ্যে এ কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল কারণ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ (সূরা আল-ফাতহ: ৩০) যেভাবে বিদ্যুতের সাথে যদি সাধারণ তারও সংযুক্ত করা হয় তাহলে এর মধ্যে মহাশক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়, তদ্রূপ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্যের ফলে তাঁর অনুসরণকারীরাও 'আশিদ্দায়ি আলাল কুফফার -এর সত্যায়ন স্থলে পরিণত হয়েছিলেন।" (সেইরে রূহানী (৬), আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২২, পৃ: ৫৯৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত উসামা (রা.)-র নেতৃত্বাধীন সেনাদলের যাত্রা সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'সিররুল খিলাফাহ্'-তে বর্ণনা করেন, ইবনে আসীর তার ইতিহাসগ্রন্থে লিখেছেন, মহানবী যখন (সা.) মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর সংবাদ মক্কায় ও সেখানকার গভর্নর আত্তাব বিন আসীদের কাছে পৌঁছায়, তখন আত্তাব লুকিয়ে পড়েন এবং মক্কা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে আর সেখানকার অধিবাসীরা মুরতাদ হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি আরো লেখেন, আরবের অধিবাসীরা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক গোত্রের সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিরাও মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, কপটতা প্রকাশ পেয়েছিল এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা মাথাচাড়া দেওয়া শুরু করে, [অর্থাৎ এটি দেখছিল যে, এখন মুসলমানার দুর্বল হয়ে গেছে, তাই আমরা এখন আক্রমণ করতে পারি।] আর মুসলমানদের অবস্থা তাদের নবীর মৃত্যুর কারণে, উপরন্তু নিজেদের সংখ্যালঘুতা ও শত্রুর সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এমন হয়ে গিয়েছিল যেরূপ বর্ষণমুখর রাতে ভেড়া-ছাগলের হয়ে থাকে। [অর্থাৎ অতিরিক্ত ভিজে যাওয়ার দরুন স্বাভাবিক নড়াচড়া করার শক্তি থাকে না।] এতে লোকজন হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, লোকজন কেবল উসামার সেনাদলকেই মুসলমানদের সেনাদল জ্ঞান করে থাকে। আর যেমনটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আরবরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাই মুসলমানদের এই দলটিকে আপনার থেকে পৃথক করা (এই মুহূর্তে) সমীচীন হবে না।

একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যদি নিশ্চিতও হই যে, বন্য পশুর দল আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, তবুও আমি রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে উসামার বাহিনীকে অবশ্যই পাঠাবো। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাআমি বাতিল করতে পারি না। (সিররুল খোলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৪)

মোটকথা, তিনি মহানবী (সা.)-এর আদেশকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন ও কার্যকর করেন এবং যে-সকল সাহাবী হযরত উসামার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদেরকে আবার বাহিনীতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে পূর্বে উসামার বাহিনীতে ছিল এবং রসূলু ল্লাহ্ (সা.) যাকে এতে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে যেন কখনো পিছিয়ে না থাকে এবং আমি তাকে পিছিয়ে থাকার অনুমতি দেবো না; এমনকি তাকে পায়ে হেঁটে যেতে হলেও সে অবশ্যই সাথে যাবে। ফলে কেউই আর পিছিয়ে রইলেন না, অর্থাৎ সবাই রওয়ানা হলেন। (শারাহ আল্লামা যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.)-র এই বাহিনী প্রেরণের বিষয়ে লেখা হয়েছে, যখন হযরত আবু বকরের নির্দেশ অনুসারে উসামার সেনাদল জুরফ নামক স্থানে একত্রিত হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিজে সেখানে যান এবং গিয়ে বাহিনী পরিদর্শন করেন ও সেনাদলকে সুবিন্যস্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে এটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামা (রা.)-কে বলেন, আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে হযরত উমর (রা.)-কে আমার কাজকর্মে সহায়তার জন্য রেখে দিন। কারণ হযরত উমর (রা.) -ও তখন ঐ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উসামা (রা.) অনুমতি দেন। (সিররুল খোলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৪) (সিররুল খোলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৪)

এই ঘটনার পর যখনই হযরত উমরের (রা.) সাথে হযরত উসামার (রা.) সাক্ষাৎ হতো, এমনকি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরেও তাকে সম্বোধন করে বলতেন,

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 15 Jan 2026 Issue No.3

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়্যুহাল আমীর, অর্থাৎ হে আমীর! আসসালামু আলাইকুম। আর এর জবাবে হযরত উসামা (রা.)-ও বলতেন, গাফারাল্লাহু লাকুম (অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন)।

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামা (রা.)-কে তাঁর নিজস্ব নির্দেশনার পাশাপাশি এ -ও বলেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাকে যা কিছু করার নির্দেশ দিয়েছেন- তুমি সবকিছু করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ পালনে কোনো প্রকার অলসতা দেখাবে না।

(আল কামিল ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯৯-২০০) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৪)

যুদ্ধের বিবরণ আগেই বর্ণনা করা হয়েছে, আমি তা বাদ দিচ্ছি। মহানবী (সা.) যেমনটি বলেছিলেন, এই বাহিনী সফল হয়ে ফিরে আসে। শত্রুরা হয় নিহত হয়েছে নতুবা বন্দি হয়েছে। এই যুদ্ধে কোনো মুসলমানেরই কোনো প্রাণহানি হয় নি। বর্ণনা অনুযায়ী এই বাহিনী চল্লিশ থেকে সত্তর দিন বাইরে থাকার পর মদীনায় ফিরে এসেছিল।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-র এতটাই ভালোবাসা ছিল যে, উসামার সেই পতাকাটি- যেটিতেমহানবী (সা.) নিজের হাতে গিঁট দিয়েছিলেন; যেটি সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন, এটা কীভাবে সম্ভবযে, আবু কুহাফার পুত্র সেই পতাকার গিঁট খুলে দেবে যা মহানবী (সা.) নিজের হাতে লাগিয়েছেন?

বস্তুত উসামার বাহিনী ফিরে আসার পরেও সেই পতাকার গিঁট খোলা হয় নি এবং সেই পতাকা পরে হযরত উসামা (রা.)-র বাড়িতেই ছিল, যতদিন না হযরত উসামা (রা.)-র মৃত্যু হয়। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০০) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৭)

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ।

যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা এখানেই সমাপ্ত হলো। ভবিষ্যতে জীবনী সংক্রান্ত আরো কিছু দিক পর্যালোচনা হবে, ইনশাআল্লাহ্ ; আমি দেখব।

এখন আমি দুইজন প্রয়াত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করতে চাই এবং পরে ইনশাআল্লাহ্ জানাযা পড়াবো। শ্রদ্ধেয় আযীযুর রহমান খালিদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলা সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়সে আমেরিকায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমের নানা হযরত মিয়াঁ রাঙ্গা আলী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। আযীযুর রহমান খালিদ সাহেবের জামেয়াতে ভর্তি হবার ঘটনাটি হলো- তিনি বলেন, আমি যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়তাম তখন একদিন তালীমুল ইসলাম হাইস্কুলের অ্যাসেম্বলিতে হযরত মওলানা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব আসেন এবং জীবন উৎসর্গের আবশ্যকতা ও গুরুত্বের ওপর বক্তৃতা করেন। এর ফলে অনেক ছাত্রের ওপর এই বক্তৃতার খুব প্রভাব পড়ে। বক্তৃতা শেষ হলে মরহুমের ভেতর জীবন উৎসর্গ করার স্পৃহা জেগে ওঠে; তিনি সোজা জামেয়াতে চলে যান। সেখানে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের পর ১৯৬০ সালে জামেয়াতে তার ভর্তির সুযোগ লাভ হয় এবং ১৯৬৯ সালে জামেয়া থেকে তিনি শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। জামেয়াতে নয় বছর লাগার কারণ হলো, এক ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনি ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হন, এর ফলে দুই বছর অপচয় হয়। কিন্তু যা-ই হোক, তিনি সাহস হারান নি আর তার জীবনও রক্ষা পায়। তিনি একথা বলতেন, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র দোয়ার কল্যাণে আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। মুবাল্লিগ হওয়ার পর তিনি বাইরের বিভিন্ন দেশ যেমন সিয়েরা লিওন, নাইজেরিয়া, ঘানা, তানজানিয়া, জাঞ্জিবার প্রভৃতি দেশে ছিলেন। এছাড়া পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে মুরব্বী হিসেবে সেবা প্রদান করেছেন। (বিদেশ থেকে)ফিরে আসার পর তিনি রাবওয়ায় তাহরীকে জাদীদের ওয়াকালত ইশায়াতে সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন।

তার দৌহিত্র মুরব্বী হামযা উবায়দুল্লাহ্, জামেয়া থেকে পাশ করেছেন; তিনি বলেন, আযীযুর রহমান সাহেব বলতেন, আফ্রিকাতে এমন সময়ও আসত যে, ভাতের ওপর লবণ ছিটিয়ে খেতাম, এছাড়া কোনো তরকারি বা অন্য কোনো খাবার জিনিস থাকত না। আর কখনো কখনো এমন দিনও আসত যখন সামান্য খাবারও পাওয়া যেত না , ভাতও থাকত না। মাঝে মাঝে কয়েক দিন উপোসও থাকতে হতো।

অতএব এটি ছিল প্রথমিক যুগের মুরব্বী-মুবাল্লিগদের অবদান যা বর্তমান যুগের মুরব্বী-মুবাল্লিগদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

তার পুত্র আনিসুর রহমান আনাস বলেন, কখনো খাবার অপচয় হতে দিতেন না। জলসার সময়েও বহুবার এমন হয়েছে যে, প্লেটে খাবার নেওয়ার পরিবর্তে টেবিলের ওপর অবশিষ্ট রুটির যে টুকরোগুলো থাকত সেগুলোই খেতেন। আর বলতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যদি এই রুটির টুকরো খেতে পারেন তবে আমরা কেন খেতে পারব না? যৌবনকাল থেকেই তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। সদাচারী, বন্ধুভাবাপন্ন, সহানুভূতিশীল, পুণ্যবান, পরিশ্রমী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। খিলাফতের সাথে গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। মরহুম মূসীও ছিলেন। আমি যখন ঘানায় ছিলাম তখন তিনিও আমার সাথে ছিলেন । পরম বিশ্বস্ততার সাথে, ভীষণ পরিশ্রমের সাথে এবং নিতান্তই অকৃত্রিমভাবে তিনি কাজ করেছেন, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন। তার দুইজন পুত্র ও তিনজন কন্যা এবং অনেক পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী আছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো শ্রদ্ধেয় ইদী হুমাইদী সাহেবের; তিনি ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ২২ নভেম্বর তিনি উমরা করার সৌভাগ্য লাভের পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে এই অসুস্থতায় ৭৭ বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারাতে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার পরিবারে ১৯৩০-এর দশকে আহমদীয়াত আগমন করে যখন তার মামা মোহাম্মদ রউফ সাহেব হযরত মওলানা রহমত আলী সাহেব (রা.)-র মাধ্যমে বয়আত গ্রহণ করেন। এরপর তারা নানা এবং মা-ও বয়আত গ্রহণ করেন। তার জামাতা বাসুকী আহমদ সাহেব একজন মুরব্বী সিলসিলা। তিনি বলেন, দিবানিশি তার তবলীগ করার আগ্রহ ছিল। আর এই বাসনাই রাখতেন, তবলীগের পথেই জীবন বিলিয়ে দেবো। তিনি আরো বলেন, যখনই আমাদের সাক্ষাৎ হতো তখন সর্বদা তবলীগই আলোচ্য বিষয় হতো। তার তবলীগের ধরনও অনেক মুবাল্লিগের জন্য অনুকরণীয় হতো। তার কন্যারাও লিখেছেন, আযানের পূর্বে মসজিদে চলে যেতেন এবং যিকরে এলাহীতে রত থেকে সময় অতিবাহিত করতেন। প্রত্যহ কুরআন তিলাওয়াত করতেন , অনুবাদ ও তফসীর পাঠ করতেন, তবলীগের জন্য প্রয়োজনীয় আয়াত চিহ্নিত করতেন। কখনো তাহাজ্জুদের নামায বাদ দেন নি। ৭৬ বছর বয়সেও তবলীগের জন্য মোটরসাইকেলে সফর করতেন। সন্তানদের বলতেন, সম্পদ কুরবানী করতে কার্পণ্য করবে না, এটি আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকার। সাধ্যানুযায়ী যত বেশি পারো আর্থিক কুরবানী করো। আর সাবধান! জামা'তের সম্পদ থেকে একটি কানাকড়িও ব্যবহার করবে না; এর হিসাব দিতে হবে। উমরার সময় তার দলের যিনি দলনেতা ছিলেন, তিনি লেখেন, উমরা চলাকালীন পুরোটা সময় মরহুম বলতেন, এখান থেকে ফেরত গিয়ে আমি তবলীগ করব আর মানুষজনকে বলব, আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা মক্কায় হজ্জব্রত পালন করেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে একজন ডাক্তার তার চিকিৎসা করেছিলেন আর তার মৃত্যুর পর সেই ডাক্তার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার পু ণ্যকর্মসমূহকে পছন্দ করেছেন বিধায় জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ হবার সৌভাগ্য পেয়েছেন। অর্থাৎ তার সেখানেই মৃত্যু হয় এবং সেখানেই জান্নাতুল বাকীতে তার দাফন হয়েছে। আর পাকিস্তানে আমাদের আহমদীদেরকেনিজস্ব কবরস্থানেও দাফন করতে বাধা দেওয়া হয়; আর নিকটে অন্য কোনো মুসলমানের কবর থাকলে তারা বলে, এই (আহমদীর) কবরের ধারেকাছে ভিড়বে না! অপরদিকে দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এখন পারলে তারা (তথা বিরুদ্ধবাদীরা) সেখান থেকে তার কবর উপড়ে ফেলুক! কিন্তু তাদে র এত ক্ষমতা কোথায়? ইনশাআল্লাহ্ , এই মৌলবীরা নিজেরাই নিজেদের চূড়ান্ত মন্দ পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়া জামা'তের সেক্রেটারি তবলীগ বানাওয়ান ওয়ারদী সাহেব বলেন, একজন সফল ও অত্যন্ত উদ্যমী দাঈ ছিলেন, যিনি 'একটি দিনও তবলীগ ছাড়া অতিবাহিত হবে না'- এই স্লোগানকে প্রকৃত অর্থেই নিজের জীবনের অংশে পরিণত করেছিলেন। তার একটি পুরোনো মোটরসাইকেল ছিল, সেটিতে চড়ে তিনি দূরদূরান্তের গ্রামগঞ্জে সফর করতেন আর যে-সব এলাকায় জামা'তের বিরোধিতা ছিল সেখানেও যেতেন। শত শত মানুষকে তবলীগ করার মাধ্যমে তাদের মাঝ থেকে বেশ কয়েকজনকে তিনি বয়আতও করিয়েছেন। তিনি বলেন, খিলাফতের সাথে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল, গভীর ভালোবাসা ও হৃদ্যতা ছিল। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি চার কন্যা ও দশজন নাতি নাতনি রেখে গিয়েছেন। আমি পূর্বেই বলেছি, তার একজন জামাতা আছেন যিনি মুরব্বী। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। (আল ফজল, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০২৫)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir